সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম, বিজ্ঞান : লক্ষ্য একটাই

মানুষ প্রথমে শুরু করেছিল প্রকৃতিকে জয় করতে। যে প্রকৃতির কাছে মানুষ বড় অসহায়। আমরা বড় বড় যুদ্ধ করতে পারি। রাজাকে উলটে সিংহাসন থেকে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়কে রোখার বা কোনও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে নেভানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। খরা হলে দুর্ভিক্ষ হবে, জরা হলে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। সেই অদম্য প্রকৃতির মধ্যে আমরা বসে আছি। আর এই বোধ আমাদের কুঁকড়ে দিচ্ছে, প্রকৃতির চেয়ে আমরা কত ছোট!

প্রকৃতি আসলে মানুষকে পরোয়া করে না। ইচ্ছেমত ঘটনা সে ঘটিয়ে চলে। মানুষকে এর মধ্যে মানিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এই মানিয়ে থাকা কেন? প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে, এই পরোয়াহীন প্রকৃতির অধিকারী কে? প্রকৃতি তো আমার নয়। আমি এই প্রকৃতিতে এসেছি। কেন এসেছি? কে এনেছে? আমি একজন মানুষ। কিন্তু আমার আদি কী ছিল? এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পরই বা আমার কী থাকবে? উত্তর নেই। এই যে একটা ভাবনা, এই যে একটা অভাব বোধ, সেই অভাব বোধের মধ্যেই বসে আছেন সেই অলৌকিক অজ্ঞেয় ঈশ্বর। যাঁকে জানা যায় না, শোনা যায় না। যাঁর সম্পর্কে আমরা শুধুই অনুমান করে নিতে পারি।

সিন্ধু নদীর তীরে আর্য মুনিঋষিরা কিন্তু কোনও মূর্তির উপাসনা করেন নি। তাঁরা শক্তির উপাসনা করেছেন। প্রকৃতির উপাসনা করেছেন, সূর্যের উপাসনা করেছেন, আবহাওয়ার উপাসনা করেছেন, ফসলের উপাসনা করেছেন, নদীর উপাসনা করেছেন। বেদ এমন কথাও বলেছে, অন্নই ঈশ্বর। কারণ অন্ন আমাদের প্রাণদাতা। বৈদিক কালে কোনও ঈশ্বরের উল্লেখ নেই। যা আছে তার সবটাই প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ। আর এই প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধান করতে গিয়েই তাঁরা শক্তির উৎসস্থলে পৌঁছেছেন। এবং আতঙ্কিত হয়েছেন। এই যে প্রকাণ্ড সূর্য, এর প্রখর রশ্মি, যা না থাকলে জীবনের কোনও অস্তিত্ব থাকত না। এই যে নদী, সেই নদীর জলই জীবন। এ জল আসছে কোথেকে? কোন্ উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে বরফ জমে আছে। যেখান থেকে গলে গলে নানারকম স্রোতধারায় বিভক্ত হয়ে গঙ্গেচ, যমুনেচৈব গোদাবরী, সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু, কাবেরী। ঋষিরা পূজায় বসে কোশা এবং কুশির জলে ডান হাতের উপর বাঁ হাত রেখে যে মন্ত্রটি প্রথমে বলতেন, নর্মদে সিন্ধু কাবেরী অস্মিন সন্নি ধিং কুরু। অর্থাৎ আমার এই কোশার জলে নদীসমূহ এসে সমবেত হও। এতে ওই জল পবিত্র হয়ে যেত।

সুতরাং জলের মধ্যে তাঁরা ঈশ্বরকে দেখলেন। আকাশে, বাতাসে, মেঘের গর্জনে তাঁরা ঈশ্বরকে দেখলেন। ঝড়ে, খরায়, জরায় তাঁরা ঈশ্বরকে দেখলেন। অনুভব করলেন এক অদৃশ্য শক্তিকে। যে শক্তি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এরকমভাবে বিজ্ঞানীরাও তাঁদের মতো করে এগোতে এগোতে শক্তিতত্ত্বের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমরা যাঁকে ঈশ্বর বলছি, বিজ্ঞানীরাই তাঁকে বললেন, এ ব্রহ্মাণ্ড একটি শক্তিপুঞ্জ। শক্তির বিস্ফোরণ। আমরা যাকে ওঁকার বলছি, ওরা তাকেই বলছেন বিগ ব্যাং। ঈশ্বর ভাবনার সর্বোচ্চ স্তরে তাই ঈশ্বরের কোনও রূপ নেই।

ঈশ্বরের শক্তি আছে, ঈশ্বরের জ্যোতি আছে। তিনি একই সঙ্গে আলো, একই সঙ্গে অন্ধকার। আমাদের তান্ত্রিকরা এই ধারণা নিয়েই মা কালীর সৃষ্টি করলেন। তাঁর পায়ের তলায় শুইয়ে দিলেন সাদা রঙের শিবকে। অর্থাৎ দিবস এবং রজনী। মা কালী হলেন Mystery, সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দের মা কালী তত্ত্ব অতি সুন্দর। তিনি বলছেন, মৃত্যুরূপা কালী। স্বামীজীর বিখ্যাত কবিতার লাইন Who dares misery love and hug the form of death dance in destructions dance to him the mother comes. এই 'মাদার' বলা মাত্রই একজন রমণীর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হল। এই রমণীই হচ্ছেন প্রকৃতি।

এবার যদি ব্রহ্মবাদীদের দিকে তাকাই, তাঁরা বলবেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এ জগতের কোনও অস্তিত্ব নেই। এ এক মায়া, মরীচিকা মাত্র। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এর সহজ সমাধান করে দিয়ে বললেন, ব্রহ্মও সত্য, মায়াও সত্য। ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য। তুমিও সত্য, তোমার ঈশ্বরও সত্য। জীবাত্মাও সত্য, পরমাত্মাও সত্য। এই ব্যাখ্যাটিকে আরও প্রসারিত করলে দেখা যাবে, উপনিষদে এই সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্পর্কে বলা আছে 'তৎ জলা নীতি'। অর্থাৎ তুমি কি করছ? তুমি সৃষ্টি করছ, তুমি রক্ষা করছ আবার তুমিই ধ্বংস করছ। এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কেই ধর্মের পরিভাষায় বলা হচ্ছে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! ব্রহ্মা সৃষ্টি করছেন, বিষ্ণু সৃষ্টি রক্ষা করছেন, মহেশ্বর প্রলয় নাচন নেচে সব ধ্বংস করে দিচ্ছেন। ঈশ্বর ভাবনা আমরা সহজ ভাবে মেনে নিয়েছি। কিন্তু রাজনীতিকরা তা খারিজ করে দিয়ে বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে আফিং। এসব অবশ্য তাৎক্ষণিক সুবিধেবাদী লোকজনের কথা। যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে, যতদিন তাদের ঘরবাড়ি তৈরি হবে, ততদিন তাদের মন্দির-মসজিদ-গির্জাও তৈরি হবে। অর্থাৎ যেখানে আমার মন যেতে পারবে না, সেখানে পৌঁছে যাবে আমার আবেগ। আমার সুর। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন, আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, কোনও শক্তিরই ক্ষয় নেই। তার শুধু রূপান্তর নয়। আবার সেই রূপান্তরিত শক্তিকেও আমরা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারি।

এমন না হলে আমরা টেলিভিশনও পেতাম না, স্যাটেলাইটও পেতাম না, আর পকেটে পকেটে, সুটকেসে সুটকেসে বাজতে থাকা সেলফোনও পেতাম না। আছে বলেই আমরা খুঁজে পেয়েছি। যা নেই, তা নেই। যদি অনন্ত আকাশে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই ইলেকট্রিক ফিল্ড, এই যে শব্দের প্রসারণ, যদি না থাকত, মানুষ কী করত? যদি একটা বদ্ধ দেওয়াল থাকত, যার কোনও ব্যাপ্তি নেই, যার কোনও দরজা জানলা নেই, যার কোনও গবাক্ষ নেই, যা কোথাও উন্মোচিত হতে পারে না, সেই জগতে থাকা তো কফিনে থাকা! এই পৃথিবী তো কফিন নয়। এ তো বিরাট গোল জাহাজ! ছয়শো কোটি মানুষ এই অনন্তে ভাসছে। এখান থেকেই মানুষের মেধা দিয়ে তৈরি মহাকাশযান চলে গেছে শনির উপগ্রহ টাইটান-এ। সেখানে অবাক হয়ে মানুষ দেখছে, পৃথিবীতে যেমন জলের সমুদ্র, ওখানে তেমনি মিথেনের সমুদ্র। সেখানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে মিথেনের, সেখানে হাইড্রো কার্বন রয়েছে। এই হাইড্রোজেন আর কার্বনই জীব সৃষ্টির, জীবন সৃষ্টির, জীব দেহের সৃষ্টির, মেধা সৃষ্টির, স্নায়ু সৃষ্টির মূল উপাদান। সেই জন্য বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন Chance combination of hydrogen, carbon and oxygen brought forward life in this world. এই combination অচানক ঘটে গেছে। একেই বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন বিগ ব্যাং। কোথাও কিছু ছিল না। তাও যেন ফেটে পড়ছে সৃষ্টির ঐশ্বর্য। তাহলে প্রশ্ন আসে, স্রষ্টা কে? কে ঘটাল? কি ভাবে ঘটাল? আগুন জ্বালাতে গেলে দেশলাই কাঠি ঠুকতে হয়, মাইক্রো ওভেনে বিদ্যুৎ জোগাতে হয়। রেডিও চালাতে পাওয়ার প্লাগ অন করতে হয়। এই অন তাহলে কে করলে? কেউ জানে না। কেউ বলতে পারবে না 'Now here the creation starts'।

বিশ্বজুড়ে গবেষণা চলছে, মানুষ প্রথম কোথায় এসেছিল? বলা হচ্ছে কেনিয়ায় এসেছিল। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, যাতে বলা হয়েছিল 'এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণী, সেখান থেকে ক্রমশ মানুষে রূপান্তর', সে তত্ত্বটিকে কিছুদূর গ্রহণ করে বিজ্ঞানীরা আজ তা বাতিল করে দিয়েছেন। কারণ evolution of brain. মানুষের মাথাটা কোথা থেকে এল? সেটা আজও রহস্য। প্রশ্ন। জীবিত মানুষের মাথা অপারেশন করে সেখানে কী আছে দেখতে পারি বটে। কিন্তু কীভাবে সেটা চালিত হচ্ছে, সেটা দেখতে হলে মানুষটাকে বেঁচে থাকতেই হবে। মানুষের মস্তিষ্কটা এমনই যে খুলিটাকে তুলে ফেলে তাকে খোঁচাখুঁচি করলেই মানুষটা মারা যাবে। সে কারণেই মানুষের যে জ্ঞানভাণ্ডার তা রয়েছে মানুষের পেছন দিকে। বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় একেই বলা হচ্ছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। একেই আমাদের শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হচ্ছে 'আজ্ঞাচক্র'। আমাদের মেরুদণ্ডে মূলাধার থেকে সহস্রাধার পর্যন্ত, যে ষড়চক্রের কথা বলা আছে সে চক্রের কথা চিন্তা

করেছেন আমাদের ঋষিরা! তখন তো সার্জারিও ছিল না, এম আর আই, সিটি স্ক্যানও ছিল না। ঋষিরা এসব ধ্যানে অনুভব করেছেন। বিজ্ঞানীরাও কিন্তু প্রথমে ধ্যানী। তাঁরা চিন্তা করেন, আপেল কেন পড়ল? চিন্তা করতে করতে নিউটন পেলেন মাধ্যাকর্ষণ। এবার আইনস্টাইন হঠাৎ বললেন এই মাধ্যাকর্ষণ তো পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর মাটির যোগাযোগ! কিন্তু অনন্তে কি এই মাধ্যাকর্ষণ বা গ্র্যাভিটি আছে? তখনই theory of relativity বেরিয়ে এল। বলা হল time এবং space, সময়ের নিজস্ব কোনও অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীতে 'সময়' বলে কোনও বস্তু নেই। সবই অনন্ত অখণ্ড। তাকে খণ্ড খণ্ড করা যায় না। সেখানে 'অনন্ত'র কোনও ঘড়ি নেই। সূর্য উঠছে বলে বলি ভোর হল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, বলি রাত হল। আবার সূর্য উঠল, দিন হল। ক্যালেন্ডার নির্মাতারা বললেন চব্বিশ ঘণ্টায় দিন রাত হচ্ছে। এবার পৃথিবীর সব জায়গায় সমান নয়। অতএব সমস্যা তৈরি হল। তখন গ্রীনউইচ বলে একটা জায়গা খুঁজে বের করা হল। সেখানে এসে দেখা গেল, সেটা একটি 'শূন্য'। সেখান থেকে সময়ের হিসাব করা হচ্ছে। ঘড়িতে কখনও প্লাস হবে। কখনও মাইনাস হবে। ওই লাইন যখন টপকে যাবে, তখন সেটি অ্যাডজাস্ট করার প্রয়োজন হবে। এ ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটছে পৃথিবীতে। কিন্তু যাঁরা স্যাটেলাইটে করে মহাকাশ চলে গেছে, তাঁদের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে? এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানে বসে বললেন, নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচরে।

একেই বলা হচ্ছে, আমি আছি না নেই? আমি দেখছি বলে জগৎ আমার কাছে দ্রষ্টব্য হচ্ছে। আমি যখন থাকব না? যেদিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, তখন অন্য মানুষ থাকবে! সে যখন থাকবে না তখন অন্য মানুষ থাকবে। সুতরাং একজনকে দেখতেই হবে। দেখাদেখি না থাকলে কিন্তু অস্তিত্ব থাকছে না। এটি হচ্ছে বেদান্ত দর্শনের বড় কথা।

পৃথিবীতে এত সমস্যা, ছেলেপিলেকে মানুষ করতে হবে, নিত্য রোজগার করতে হবে, কত চিন্তা! একেই ধর্মের জগতের মানুষেরা বলছেন 'মায়া'। তোমাকে অষ্টপাশে বেঁধে রাখা হয়েছে। তুমি চিন্তায় চিন্তায় না পাগল হয়ে যাও! সুতরাং অল্প লইয়া থাকি আমি তাই, যাহা যায় তাহা যায়!

ছোট্ট ঘর, ছোট্ট সংসার, ছোট্ট পরিবার, স্ত্রীপুত্র এর মধ্যেই প্রেম ভালোবাসা। এর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাবেন, এর মধ্যেই গোপাল হাতে নাড়ু ধরে বসে থাকবেন। এর মধ্যেই মা কালী মন্দিরে বসে এক হাতে ভয় দেখাবেন, এক হাতে সাহস জোগাবেন। ভয় তো বটেই। কারণ আমাকে তো মরে যেতে হবে! এই মৃত্যুভয়ের থেকে বড় ভয় তো মানুষের আর কিছু নেই। ধর্ম মানুষকে শেখাতে চাইছে, মৃত্যুভয় থেকে উত্তীর্ণ হও। এর জন্যই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই অর্জুনকে

শেখাতে চাইলেন, তোমার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। তুমি যুদ্ধ করতে এসেছ, যুদ্ধ করো। তুমি যদি আগেই মৃত্যুর কথা ভাবো, তবে তো মরার আগেই মরে যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না। আর শেক্সপিয়ার বললেন, Cowards die many times before their death.

জেনারেলরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। তাঁরাও কিন্তু যাওয়ার আগে চোখ বুঁজে তাঁর ইষ্টকে স্মরণ করে নিচ্ছেন। বিখ্যাত এক মেজর জেনারেল যুদ্ধ করতে যাওয়ার আগে তাঁর ইষ্টকে বললেন, দেখো, আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তাই আমি তোমাকে ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু তুমি যেন আমাকে ভুলো না।

অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোথায়? যখন মানুষ সংসারে প্রতিনিয়ত ঘা খায়, যখন দেখা যায় ছেলে 'ছেলে' নয়, স্বামী 'স্বামী' নয়, বউ 'বউ' নয়, যার আমি অন্নদাতা সে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে, অফিসের কলিগরা চেষ্টা করছে, যাতে আমি ওপরের দিকে উড়তে না পারি। বাসে ট্রামে উঠতে চাইছি, দেখা যাচ্ছে, সবাই আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজে উঠতে চাইছে। এই যে একটা ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতার জগৎ, এই যে একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধের জগৎ, সেখানে 'কোথায় আমার আপনজন' বলে চিৎকার চেঁচামেচি করে দেখছি সবাই conditional. শর্তসাপেক্ষ। টাকা দিলে আছে, না দিলে নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমরা কল্পনা করে নিই, তাহলে কেউ একজন নিশ্চয়ই আছে, যে আমাকে ভালোবাসে। সে আমার প্রেমিকাও হতে পারে, আবার ঈশ্বরও হতে পারে।

আমি মানুষ হয়ে কী চাই?

ঐশ্বর্য নয়। আগে চাই শান্তি। ভালোবাসা। কে আমাকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসতে পারেন? একজন বিধবা হাউ হাউ করে কাঁদছেন, তাঁকে কেউ দেখার নেই। তার গোপালটি আছে। মন্দিরে গিয়ে তিনি চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। বলছেন, আমাকে তুমি দেখো। কাশীতে গিয়ে ঘড়া ঘড়া দুধ ঢালছেন আর বলছেন, হে বিশ্বনাথ আমাকে তুমি মুক্তি দাও, মোক্ষ দাও। বেঁচে থাকার প্রাঙ্গণে এই সব চাওয়া আস্তে আস্তে এসে জমা হচ্ছে। ডাস্টবিনে যেমন বিভিন্ন জায়গার ময়লা এসে জমা হয়, সেই রকম ভাবে এখানে মানুষের ভাবনা-চিন্তা, বেঁচে থাকার পথ, উদ্ধারের পথ, শান্তিলাভের পথ, এক হয়ে মিশে যাচ্ছে। যে কারণে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমি চিৎকার করে বলছি ঈশ্বর টিশ্বর চাই না, আমি শান্তি চাই।

শান্তি কে দিতে পারেন? শান্তি দিতে পারেন একজন, ঈশ্বর। কারও ভাষায়, সেই একজন আল্লা, কারও ভাষায় সেই একজন গড। পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছেন, যাঁদের ভাতকাপড়ের সমস্যা মিটে গেছে বা মিটিয়ে ফেলতে পেরেছেন, তাঁরা বসে বসে এ চিন্তা করেছেন, পরাচিন্তা। একেই বলা হচ্ছে পরাবিজ্ঞান।

অর্থাৎ বিজ্ঞানেরও ঊর্ধ্বে যে বিজ্ঞান।

এক বিজ্ঞানীর একটা বই পড়েছিলাম। তিনি তাতে বলেছেন, বিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনা বড় সংকীর্ণ। কারণ তাঁরা আগে কিছু একটা ভেবে নেন। তার পর সেই ভাবনার সমর্থনে অন্বেষণে বেরোন। বেরিয়ে খুঁজে খুঁজে যা পান, তা যখন তাঁদের ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়, তখন তাঁরা একটা থিওরি বা তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এবার সেই তত্ত্বটাকেই জগতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর পর তা টাইম-টেস্টেড হয়। কখনও দেখা যায় সেটা বাতিল হয়ে যায়। তার জায়গায় নতুন তত্ত্ব আসে। কখনও সেটা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এতেই প্রমাণিত হয়, অনন্ত ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। নলেজের কোনও হরাইজন নেই। আজকে যত যেটুকু জেনেছি, ততটুকুই জেনেছি। সেজন্য বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরাও বলেছেন, এই পৃথিবীতে হয়তো জানার আর কিছু বাকি নেই, কিন্তু আমরা অনন্তের জমিদারিতে আছি। সেই অনন্তের কতটুকু আমরা জেনেছি, না সমুদ্রের জলের ধারে দাঁড়িয়ে শুধু পায়ের পাতাটি ডুবেছে। অনন্ত সমুদ্র রহস্যে ঢাকা হয়ে সামনে পড়ে আছে।

ঈশ্বরের অপর নাম রহস্য। সমাধানবিহীন এক রহস্য হচ্ছেন ঈশ্বর। মানুষ এর যতটুকু জানতে পারে, তাতেই সে ঢেকুর তুলতে তুলতে বলে, আহ্! বহুত হো গিয়া! আচ্ছা হো গেয়া। গৌতম বুদ্ধ এলেন, মহাপ্রভু এলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন, ওদিকে স্বামী প্রণবানন্দ, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রমুখ এলেন। তাঁরা মানুষকে একটি কথাই বলতে চেয়েছেন, আমরাও বিজ্ঞানী। আমরা অনন্তের রহস্য সমাধান করতে চাইছি।

বিজ্ঞানীদের হাতে আজ স্যাটেলাইট এসেছে। এর ফলে তাঁরা মহাবিশ্বের অনেক খবর নিতে পারছেন। কিন্তু কোপারনিকাস যখন আবিষ্কার করলেন, সূর্য স্থির। পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরছে, তখন কিন্তু তাঁকে প্রাণের ভয়ে এই সত্যটি কোড ল্যাঙ্গোয়েজে লিখতে হয়েছিল। জিওদার্নো ব্রুনো এই সত্যটিকে পৃথিবীতে ছড়াতে গিয়ে চার্চের কোপে পড়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেলেন। আসলে বিজ্ঞানেরও কণ্ঠ রোধ করা হয় ধর্ম দিয়ে। কিন্তু এখন বিজ্ঞান ও ধর্ম এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টরা এখন বলছেন, theosophy and new Physics তাঁরা এখন বন্ধুর মত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছেন। সেখানে দুটো মাত্রা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। একটা আলফা, একটা ওমেগা। আমরা কোথায় শুরু করেছি, আর হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি কোথায়? একটা গান আছে, চলেছি ভাই, একই ঠাঁই...।

তাহলে আলফা থেকে যেতে হবে ওমেগায়। আলফা বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে প্রথম মানুষ। সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে মানুষ এগিয়ে চলেছে আরও স্বাচ্ছন্দের আশায়। ওমেগার উদ্দেশে।

কিছুদিন আগে এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। দিল্লিতে তাঁর একটি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি রয়েছে। মহাকাশ নিয়ে যখন এযুগের বিজ্ঞানীরা তোলপাড় করছেন, সেই বিজ্ঞানী তখন পৃথিবীর গহ্বর জঠর নিয়ে ব্যস্ত। যেখানে লোহা এবং নিকেল টগবগ করে ফুটছে। যার ফলে পৃথিবী একটা চুম্বকে পরিণত হয়েছে। এই উত্তাপে তৈরি হচ্ছে সবচেয়ে দামী পাথর হীরা। এই বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষাগারে পৃথিবী-গহ্বরের সব রকমের অবস্থা সৃষ্টি করে হীরা তৈরি করছেন।

সুতরাং রহস্যের আমরা কতটুকু জেনেছি? পিঁপড়ে যেমন রুটির উপর ঘোরে, আমরা তেমনি পৃথিবীর উপর ঘুরে বেড়াচ্ছি। মাত্র কয়েক হাজার ফুট নিচে নেমে কিছু আবিষ্কার করে লম্ফঝম্প করছি। অথচ সমুদ্রের তলায় কত অমূল্য সম্পদ পড়ে আছে, তা আজও মানুষের জানা হল না। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মশাইকে দেখতে গিয়ে বলেছিলেন, তোমার ভিতরে অনেক কিছুই আছে। কী রকম জানো? যেমন বরুণ রাজার কত সম্পত্তি তিনি নিজেও জানেন না। তার কারণ সবই পড়ে আছে জলের তলায়। সুতরাং just we are scratching on the surface of the truth !

আলটিমেট ট্রুথ বা সত্যটা কী? যেদিন জেনে ফেলতে পারব, সেদিন মানুষ আর ভগবানে কোনও তফাত থাকবে না। কিন্তু এটি কোনওদিনই হবে না। সেই কারণে সংস্কৃতে 'সংসার' শব্দের অর্থ 'সং সরতি'। যা ক্রমশ সরে সরে যায়। 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ তন্, মানে নিজেকে প্রসারিত করো। তুমি নিজেই আকাশ, বাতাস, অনন্ত। এখান থেকেই ধ্যানের কনসেপ্ট। ধ্যান করতে করতে কি হয়? না আমি ইন্দ্রিয়ের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসি। পাখি যেন 'খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল, ডানা দুটো ঝাপটাল, তারপর শূন্যে উঠে খানিকটা প্রাণরস সঞ্চয় করে আনন্দ নিয়ে আবার খাঁচায় ফিরে এল। ধর্ম হচ্ছে আনন্দ উপলব্ধি করে, প্রাণরস সংগ্রহ করে সংসারে বেঁচে থাকা।

ঈশ্বরের দিকে তাকাবার আগে আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই, যে পৃথিবীতে আছি সে পৃথিবীর দিকে তাকাই, তাহলে একটা শব্দ, যেটা বিজ্ঞানীরাও ব্যবহার করবেন, ধর্মগুরুরাও ব্যবহার করবেন, সেটা হচ্ছে 'উপাদান'। Elements. ইংরেজদের ভাষায় আর্থ, ফায়ার, এয়ার, এনার্জি। আমরা বলব ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজৎ, ব্যোম। মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। তোমারও যা, কোটিপতিরও তা। মুক্তাঞ্চল। কোনও প্রোমোটারের ক্ষমতা নেই, টুকরো টুকরো করে কেটে সেখানে অ্যাপার্টমেন্ট বানায়। ব্যোম হচ্ছে সেই অনন্ত। এই কয়েকটি উপাদানের খেলা নিয়েই প্রাণীজগৎ তৈরি হয়েছে। নাস্তিক হোন, আস্তিক হোন এটা মানতেই হবে।

বাইবেল তার জন্য এককথায় সব বলে দিয়েছে। তোমার ধূলার শরীর, ধূলায় ফিরে যাবে। Dust thou are. তুমি সেই ধুলো। And dust thou become. এই পৃথিবীর থেকে কিছু নিয়ে মানুষ পালাতে পারবে না। উলটে তার শরীরের উপাদানগুলো পৃথিবীতে পড়ে থাকবে।

একজন মার্কিন বিজ্ঞানী ভারী সুন্দর ভাবে মানব শরীরের মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন, বলেছিলেন, মানুষের দাম মাত্র দশ ডলার। কী ভাবে? না মূল উপাদান হাড়, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অর্থাৎ চুন। কঙ্কাল তৈরি করতে লাগে বড়জোর দু'কেজি চুন। এবার একটা আবরণ চাই। যেমন লেপ তৈরি করতে তুলো চাই, তার ওপর ওয়াড় চাই, তার উপর একটা খোল চাই। এ রকমেই মানুষের আবরণের জন্য চাই তোমার মেদ, তোমার মজ্জা এবং তোমার ত্বক। এগুলো পাওয়া যাবে নাইট্রোজেন থেকে। যে নাইট্রোজেন আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অতএব তার কোনও দামই নেই। এবার চাই রক্ত। অর্থাৎ লোহা। তার জন্য দুটো মরচে ধরা পেরেক হলেই যথেষ্ট। এর জন্য কোনও দাম লাগে না। এমনি পাওয়া যায়। আর দরকার জল। অর্থাৎ হাইড্রোজেন-অক্সিজেন। এর জন্য ডলার লাগে না। অতএব একটা ব্যারেলের মধ্যে দু'বালতি জল ঢেলে, চুন আর পেরেক দুটো ফেলে দাও। অপেক্ষা করো। এবার দেখ, মানুষ হবে কী?

হবে না। মানুষের শরীরের যা যা মৌলিক উপাদান, তা সব কেমিস্ট শপে পেয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ গঠন? আজও কোনও ল্যাবরেটরি করতে পারে নি। There lies your value. কোনও কেমিস্ট, কোনও আর্কিটেক্ট এভাবে সব মৌলিক উপাদানগুলি মিলিয়ে তাতে স্পার্ক দিয়ে একটা মানুষ বানিয়ে দিতে পারবে?

বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে ভারি সুন্দর বলা আছে, on the sixth day of the creation ঈশ্বর তাকিয়ে দেখলেন সব তৈরি হয়ে গেছে। শুধু একটাই অভাব রয়ে গেছে, সেটা হল মানুষ। কারণ মানুষকে তিনি তৈরি করবেন তাঁরই আদলে। তারই মেধা, বুদ্ধি, অনুভূতির কিছুটা তিনি মানুষের মধ্যে দিয়ে রাখবেন, যাতে তাঁর হাতে গড়া মানুষ স্রষ্টার এই আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

আমি একজন শিল্পী। ছবি আঁকলাম, কিন্তু কেউ দেখল না। আমি একজন গাইয়ে। গান গাইলাম, অথচ কেউ শুনল না। তাহলে তৃপ্তি কোথায়? সার্থকতাই বা কোথায়? তাই আমি এমন জীব, এমন মানুষ তৈরি করব, যে দুবেলা বলবে আহা! ক্যায়সা বানায়া! তাই ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর পৃথিবী থেকে ধুলো মাটি তুলেই মানুষ তৈরি করলেন। তখনও তাকে প্রাণ দেওয়া হয়নি। এইবার ঈশ্বর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। কাছে গিয়ে ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক করে তিনটি শ্বাস পুরে দিলেন (There breaths of life)। মানুষটি উঠে বসল।

এই তিনটি 'শ্বাস' আমাদের শাস্ত্রে এসে হল প্রাণ, অপান, সমান। এই

তিনটেই আমাদের মেরুদণ্ডের তিনটি স্নায়ু, ইরা, পিঙ্গলা, সুষুম্নায় বইছে। আবার এই ইরা, পিঙ্গলা, সুষুম্নাই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। এর সঙ্গমস্থল আমাদের মূলাধার। এই সঙ্গমস্থল থেকে তিনটি নদী উত্থিত হয়ে খুলে যাচ্ছে আমাদের সহস্রায়। অর্থাৎ মস্তিষ্কে। সেখানে সহস্রদল পদ্মের কল্পনা করা হয়েছে। যা কিনা সব বিজ্ঞানীর ভাষাতেই mystery of the mysteries !

এক বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট আমাকে বলেছিলেন, Each of us carry a head, but nobody knows what it contents. আমরা সবাই একটা মাথা বয়ে বেড়াচ্ছি বটে, কিন্তু মাথায় কী আছে, আজও জানতে পারলাম না।

সব ম্যাপিং শেষ হয়েছে। কিন্তু ব্রেনম্যাপিং এখনও কিছুই হয়নি। চেষ্টা চলছে। এবার তাহলে মৌলিক উপাদানগুলোয় ফিরে আসি, দেখব এই দিয়েই কীট-পতঙ্গ হয়েছে, এই দিয়েই শেয়াল-কুকুর হয়েছে। আবার এসব দিয়েই মানুষ তৈরি হয়েছে। যার শরীরের ভেতরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রের খেলা। এই যে হার্ট, তাকে বলা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মিনিয়েচার পাম্প। প্রতিদিন ৬৪ হাজার গ্যালন মাথায় তুলছে, নামাচ্ছে। আমরা ঘুমিয়ে থাকি, গল্প করি, আর মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়েই থাকি, হার্ট কিন্তু তার কাজ ভুলছে না। পাকস্থলী আরেকটা অদ্ভুত ল্যাবরেটরি। কিন্তু এগুলোর কোনও কিছু নিয়েই পালিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রত্যেকটা উপাদানই ফিরিয়ে দিতে হবে।

মাটি থেকে যেটুকু নিয়েছিলাম, মাটিকে দিয়ে দিলাম। বাতাস থেকে যেটুকু নিয়েছিলাম, বাতাসে তা মিলিয়ে দিলাম। তেজ যা ধার নিয়েছিলাম, তা অনন্ত তেজঃভাণ্ডারে চলে গেল!

আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে। কিন্তু ইলেকট্রিক সে তো আমার বাড়িতে নেই। রয়েছে পাওয়ার হাউস। ইলেকট্রিক ওয়্যারিং হয়ে গেল। তারপর মিস্ত্রি বলল, সব হয়ে গেছে, এবার সাপ্লাইতে খবর দিন। ওরা কানেকশান দিয়ে যাবে। এই যে কানেকশান, সংযোগ স্থাপন, সেটা কোথায় হয়? মাতৃজঠরে। X আর Y ক্রোমোজমের খেলা। 'অধ্যাত্ম রামায়ণে' মানব সৃষ্টির প্রথম তিনদিনের মাথায় যে আঙুরটি তৈরি হল, তাকে মুনিঋষিরা বলেছেন 'কলল'। তার কোনও আকার নেই। মুনিঋষিরা আরও বলে দিচ্ছেন, সাত দিনে অঙ্কুরটির কী হবে? তিনমাসে সেটির কী হবে? কবে তার আঙুল হবে। কখন তার মাথা তৈরি হবে। কখন তার চোখ ফুটবে। কখন তার ভেতরে ব্রেন এসে উপবিষ্ট হবে। অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর এসে বসবেন। তারপর দশ মাসের মাথায় সম্পূর্ণ মানবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে বেরিয়ে আসবে। আমি সেই অধ্যাত্ম রামায়ণ বইটি দিয়েছিলুম এক বিখ্যাত গাইনোকলজিস্টকে। তিনি এটি পড়ে বললেন, অবাক কাণ্ড এইরকমই তো ঘটে। মুনিঋষিরা এসব কী করে পেলেন?

ধ্যানে পেলেন। আপনারা যেমন শাস্ত্র ধ্যানে পেয়েছেন, ওরাও তেমনি এসব ধ্যানে জেনেছেন।

এই যে মাতৃজঠরে আমরা আস্তে আস্তে প্রাণরস পাচ্ছি, তিনি রক্ত তৈরি করে আমার শরীরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, তখন আমার পার্চমেন্ট সিলও খোলা হয়নি। ইনট্যাক্ট রয়েছে। যেমন বাজার থেকে আমরা একটা কম্পিউটার কিনে আনলাম, তাতে যেমন সিল থাকে, তেমনি।

এইবার সে পৃথিবীতে এল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসেই তার ভয়ানক যন্ত্রণা শুরু হবে। তাই সে কেঁদে ওঠে চ্যাঁ চ্যাঁ করে। কাঁদতে তাকে হবেই। কারণ এই কান্নাই পৃথিবীতে প্রবেশের পর তার লাংস অর্থাৎ ওই হাঁপরটিকে কাজ শুরু করিয়ে দেবে। এই যে হাঁপর, শ্বাস নিচ্ছি ছাড়ছি, এর চেয়ে বড় দাসত্ব পৃথিবীতে আর কিছু নেই। বাড়িতে কলতলায় যারা বাসন মাজে, তারা বিরক্ত হয়ে বলে, দিনের পর দিন ঘ্যাসর ঘ্যাসর করে এই যে বাসন ঘষে যাচ্ছি, আর ভালো লাগছে না। আমরা তো তার চেয়েও বেশি বিরক্ত হতে পারি। কারণ জন্মাবার পর থেকে ৬০ বছরই বাঁচি আর ৯০ বছরই বাঁচি, শ্বাসের হাঁপর আমাকে টেনে যেতেই হবে। এর থেকে বিশ্রাম নিতেও পারব না। কোনও লোককেও বলতে পারবো না, ভাই, আমার হয়ে একটু শ্বাস নিয়ে নে তো! আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

অতএব লাংস ওপেন করতে গেলে শিশুকে বাঁচতে হবে। না কাঁদলে ধরে নিতে হবে, এ শিশু বাঁচবে না। লাংস অর্থাৎ ফুসফুসে এমন মডিউল বসানো আছে যা আমার রক্তে অক্সিজেন পাঠাবে। আমি বাঁচব। কী ভয়ানক রহস্য!

আমরা যদি ঈশ্বরের কথা না ভাবি, তাহলে এই রহস্যের কথাও তো চিন্তা করতে পারি।

সামান্য এক বিন্দু বীর্য, তার মধ্যে বসে আছে কোটি কোটি কীট! রুদ্ধশ্বাসে তারা ছুটে যায় ডিম্বানুর দিকে। যে মুহূর্তে সবচেয়ে শক্তিশালী শুক্রাণুটি ডিম্বানুর সঙ্গে মিলিত হয়, সে মুহূর্তেই একটি স্পার্ক হয়। Spark of life. কে ঘটাচ্ছেন সেই কাণ্ডটি?

ঈশ্বর! ঈশ্বরই সেখানে বসে এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটিয়ে দিচ্ছেন। তার ফলেই বেরিয়ে আসছে 'প্রাণ' বা life। তবে 'লাইফ' শব্দটির তুলনায় 'প্রাণ' শব্দটির অনেক বেশি ব্যাপ্তি। উপনিষদে বলা হয়েছে, যৎ প্রাণেন প্রাণিত। ওই যে স্পার্ক, তা যদি একটুও বিঘ্নিত হয়, তবে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হবে। উপনিষদের একটি, বৃহদারণ্যক উপনিষদ শুধু এই তত্ত্বের উপর নিয়োজিত। সেখানে একথাও বলা আছে, তুমি কি তোমার সন্তানকে যোদ্ধা হিসাবে পেতে চাও? তা হলে এই করো। জ্ঞানী সন্তান চাও তো এই দিনে মিলিত হও। সব কিছু সেখানে পঞ্জিকাকারে বিশদ ভাবে বলে দেওয়া আছে।

মানুষকে তো জানতে হবে, মানুষের চলাটা কোন্ পথে চলা? একটা মানুষ কিছুদিন চলতে চলতে তো মরে যাবে। কিন্তু এই যে collective human progress, এর কথা তো চিন্তা করতে হবে। এবং সেই progress is nothing but thought progress, seer's progress. যারা দেখতে পারেন, তাঁরা অনুভব করতে পারেন। সুতরাং অনুভূতি এগিয়ে চলেছে। যার অনুভূতি যত সুক্ষ্ম, তার ধারণাও তত সুক্ষ্ম হবে। আমাদের শাস্ত্রে একটি কথা আছে—'ধারণা'! তুমি ধারণা করো, ধারণ করো। অর্থাৎ তোমার মস্তিষ্কের কোষে সেই বস্তুগুলোকে নিয়ে এসো। অ্যানালিসিস হার্টেও হচ্ছে না। লিভারেও হচ্ছে না। অ্যানালিসিস হচ্ছে একমাত্র মস্তিষ্কে। চোখ দেখছে, খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে ডিসাইফার করে দিচ্ছে। এই হচ্ছে চেতনা।

এভাবে অনেকগুলো শব্দ এল। অনুভূতি, চেতনা, প্রাণ। যে শব্দগুলি ভারতীয় দর্শনে বহু অর্থদ্যোতক, বহুব্যাপক শব্দ। ইংরাজিতেও আছে। তবে সে সব শব্দের অর্থ এত ব্যাপ্ত নয়। আসলে ইংরাজি ভাষারও তো সংস্কৃত থেকে জন্ম। শুধুমাত্র স্লাভনিক ভাষাগুলো ছাড়া পৃথিবীর সব ভাষারই মা সংস্কৃত। সংস্কৃত তাই দেবভাষা।

সেদিন একজন আমাকে ব্যঙ্গ করে বললেন, দেবভাষা আবার কী? তা আমি তার সঙ্গে কথা বলতেও পারলাম না। আসলে দেবভাষা হচ্ছে সেই ভাষা, যে ভাষা mother of all languages. 'দেব' মানে 'প্রধান', 'দেব' মানে 'দেবতা' নয়। যেমন গঙ্গা থেকে অজস্র নদী বেরিয়ে এসেছে। এখন যদি কেউ বলে গঙ্গার সঙ্গে ধর্মের যোগ হয়ে গেছে, অতএব গঙ্গাকে আর 'গঙ্গা' বলা যাবে না, অন্য কোনও নাম দেওয়া হোক, তখন বলতে হবে সেই কথাই : what is in a name? Rose is a rose... নাম আসলে কিছুই নয়, কয়েনেজ। পরিচিতি। আর এই বোধই তো হাজার বছর ধরে মানুষ নিয়ে আসছে। সেগুলিকে পালটে দিলেই বিরাট অমৌলবাদ হয়ে গেল, সে কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এগুলো একধরনের পলিটিকাল নাচানাচি। স্বল্প জলে সফরি ফরফরায়েৎ। অধিক জলে তারা ফরফর করতে পারে না।

তাহলে কী পেলাম? ব্রহ্ম সত্য, না জগৎ সত্য? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, দুই সত্য। ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য। ব্রহ্মও সত্য, মায়াও সত্য। যেমন গঙ্গা থেকে বা পুকুরের গভীর থেকে এঁটেল মাটি তুলে নিয়ে নানা মূর্তি তৈরি হয়। আবার এই মাটি দিয়েই ঘোষ, বোস, মিত্তির, বড়লোক, বিল গেটস, টাটা, বিড়লা তৈরি হচ্ছে। একটি গান আছে : ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান। হেথা এলে পড়ে যায় মায়া সব। রয় না ভবে জরার উপদ্রব। এই গানেতেই বলা আছে মূর্খ কি বিদ্বান, রাজা আর ভিখারি, সকলে সমান। কখন? না death is the leveller. মা সারদা

বলেছেন, যেই পুড়ে মরুক, এক সের ছাই। এই ছাই হচ্ছে পৃথিবীর মৌলিক উপাদান। এই উপাদান আমি পৃথিবীতে ফেরত দিলাম। কিন্তু এনার্জি? এই Energy escapes to the field of energy. শক্তি চলে গেল শক্তির জগতে। এনার্জির field theory নিয়েই আজকের বিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি এগোতে পেরেছে। এখান থেকে টাইটানে যে উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে তা কোটি কোটি মাইল দূরেও পৃথিবীর নির্দেশ মেনে কাজ করছে। এর সবটাই এর এনার্জি, ওয়েভ। ওঁরা এখন বলছেন, মহাপ্রভুর সংকীর্তন বা খ্রীস্টের সারমন অন দ্য মাউথ আমরা পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। কারণ, ক্ষয় নাই তোর ক্ষয় নাই, ওরে ভয় নাই তোর ভয় নাই! কিছু ক্ষয় হয় না। কোনও কিছু হারায় না। সবই থেকে যায়। পালানোর পথ নেই।

মনে রাখতে হবে গ্র্যাভিটেশন বলতে আপেল পড়ে যাওয়া নয়। গ্র্যাভিটেশন মানেই যারা এখানে ঢুকে পড়েছে, তাদের একটা ফিল্ডের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে। বিভিন্ন আকার আকৃতি নিয়ে। এখান থেকে তারা কিছুতেই মুক্ত হতে পারবে না। অন্তত তাদের এনার্জি এখানে থেকে যাবে। যেমন, মানুষ মরে যেতে পারে। মানুষের লেখা বই মরতে পারে না। যুগ যুগ ধরে তা বেঁচে থাকে। অতএব তাঁর এইটুকু সৃষ্টি যদি বেঁচে থাকতে পারে, তা হলে মানুষ, পৃথিবীর সেরা সৃষ্টি, যার রহস্যের আজও সমাধান হল না, তার স্রষ্টাকে স্বীকৃতি জানাতে হবে না?

গিরিশচন্দ্র গান গাইছেন, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই। জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, ফিরে ফিরে আসি, আমি কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই!

কেউ মরে গিয়ে ফিরে এসে বলবে না, আমি অমুক জায়গায় গিয়েছিলাম। বিজ্ঞানীরা এখন চেষ্টা করছেন। ট্রমা ভিকটিমদের নিয়ে নিউরোলজিস্টরা বসে আছেন। Near death experience-এর উপর অনেক অনেক বইও হয়েছে। হার্ট অ্যাটাক হয়ে কারও হয়তো মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু তার ব্রেন ডেথ হয়তো হয়নি, ফিরে এসে সে কী বলছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কিন্তু মুশকিলটা হল, স্বপ্ন তো আমরা সকলেই দেখি। কিন্তু ঘুম ভাঙলে সে স্বপ্নের কতটা আমরা মনে রাখতে পারি? তবুও যেটুকু মনে থাকে আমরা অবাক হয়ে যাই, কী করে স্বপ্নে ওই অদৃশ্য অলৌকিক দুনিয়া দেখে ফেললাম? বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলছেন, যা নেই, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। কারণ কল্পনারও প্যারামিটার বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তুমি ঘরের ভেতর ঢোকার আগেই ঘরটি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার তুমি ঘরে এসো এবং আবিষ্কার করো, কী কী তোমার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

সুতরাং জীবনের কথা হল তুমি প্রবেশ করো। সব সাধনাই [illegible] জীবন ছেড়ে বেরিয়ে যেয়ো না। যত গভীরে যাবে, তত বেশি তুমি খুঁজে পাবে। 'তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবি রে প্রেম রত্নধন। ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।' সুতরাং ধর্ম, বিজ্ঞান, বেঁচে থাকা, অনুভূতি, সংগ্রাম—সবই কিন্তু একই পথে, একই মার্গে দৌড়চ্ছে। কেউ আলাদা আলাদা পথে যেতে পারে না। কারণ, স্বয়ং ঈশ্বর এই সমন্বয়টি আমাদের দেহভাণ্ডে ঘটিয়ে রেখেছেন। যে কারণে বলা হচ্ছে, যা আছে ভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে! অতএব জগৎও সত্য, ঈশ্বরও সত্য। সৃষ্টিও সত্য। স্রষ্টাও সত্য।

প্রাণের সাধনা

আমাদের প্রাণ কোথায় আছে? বায়ুতে। আমাদের শরীরে একটা Captive Air আছে। নিরুদ্ধ বাতাস, যার সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনও যোগ নেই। প্রশ্বাসে বাইরের বাতাস ফুসফুসে ঢুকছে অক্সিজেন হয়ে, নিঃশ্বাসে সেই বাতাসই বেরিয়ে যাচ্ছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড রূপে। এ এক যান্ত্রিক ক্রিয়া। প্রাণবায়ু সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। জীবশরীরে কে কিভাবে ভরে দিলেন বলা শক্ত। আমরা যখন মাতৃজঠরে, তখনই এই বায়ু জীবশরীরে প্রবিষ্ট হয়। জীবযন্ত্র তখন মোড়কে মোড়া। হৃদয়, ফুসফুস, যকৃৎ, মূত্রাশয় যাবতীয় প্রাণযন্ত্রের প্যাকিং তখনও খোলা হয়নি। সব প্রস্তুত হয়ে আছে, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই একটি ক্রন্দনে সব চালু হবে। এই প্রাণের মেয়াদ কত দিন? যতদিন না এই প্রাণবায়ু তিনটি খাবিতে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। সহজিয়া বাউলের গানে যার সহজ ব্যাখ্যা—একদিন উড়বে সাধের ময়না। পাখির সঙ্গে যার তুলনা। কমনে দিয়ে ফুড়ুক করে উড়ে যাবে কেউ জানবে না।

এই রহস্যের উন্মোচন সম্ভব নয়। আমরা বাঁচি; কিন্তু জানি না, প্রাণ কাকে বলে। কোমার রোগীকে হার্ট লাংস যন্ত্রে ফেলে দেহটাকে ধরে রাখতে পারি; কিন্তু তাকে জীবন বলে না—বলে সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশান। নড়বে না, কথা বলবে না, চোখ চাইবে না। মানুষের যন্ত্রে সে কিছুদিন ধরা থাকবে, তারপর সে চলে যাবে। মৃত্যু।

ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনীটি বড় সুন্দর। অনেকটা 'বিগ ব্যাং' তত্ত্বের অনুরূপ। Our of nothing came everything. মহাশূন্য, নিরাকার ব্রহ্ম। সৃষ্টিকর্তা তৈরি করলেন স্বর্গ ও মর্ত্য। সেই পৃথিবীর প্রাথমিক কোনও আকার ছিল না। মহাশূন্য ঘোর ঘন অন্ধকার। সীমাহীন গভীর। ঈশ্বরের মহাশক্তি কেবল জলধারায় প্রবাহিত।

স্রষ্টা একদিন বললেন—'Let there be light' and there was light. তিনি বললেন, আলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার উদ্ভাসিত। তিনি অন্ধকার আর আলোকে

পৃথক করলেন। তাই ত হল দিন আর রাত। সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনে বললেন—এই মহাজলধিতে একটা ছাত তৈরি হোক। সঙ্গে সঙ্গে তাই হল। ওপরে জল, নিচে জল, মাঝে সেই ছাত। এই ছাতই হল স্বর্গ।

তৃতীয় দিনে ঈশ্বর বললেন, স্বর্গের নিচের সমস্ত জলরাশি একত্রিত হোক। আর স্থলভাগ জেগে উঠুক। শুষ্ক স্থলভাগের নাম রাখলেন পৃথিবী আর একত্রিত জলরাশির নাম রাখলেন সমুদ্র। মৃত্তিকা সজীব হও। লতা, গুল্ম, বৃক্ষাদির জন্ম হল। সকলেই বীজধারণের ক্ষমতার অধিকারী। সেই বীজ থেকে আরও আরও গাছপালা।

চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করলেন দিনের সূর্য, রাতের তারা। পঞ্চম দিনে সৃষ্টি করলেন জলচর ও খেচর। তাদের আদেশ দিলেন, অনন্তকাল ধরে তোমরা বর্ধিত হও। ষষ্ঠ দিনে প্রথমে সৃষ্টি করলেন স্থলচর প্রাণী আর সেই দিনেই বিশিষ্ট মুহূর্তে সবিশেষ যত্নে তিনি সৃষ্টি করলেন শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মৃত্তিকাকে ছাঁদে ফেলে তৈরি হল মানব। ছাঁচ থেকে প্রথম মানুষটিকে বের করে মাটিতে শোয়ালেন—প্রাণহীন মূর্তি। তারপর, He himself breathed the breath of life into it. Through its nostrills, He breathed the breath of life –and man became a living being. প্রাণবায়ু তিনিই ভরে দিলেন নাসাপথে। সেই প্রাণের লীলা আজও চলেছে।

আর এই প্রাণের সাধনাই হল শ্রেষ্ঠ যোগ। আমরা বেঁচে আছি; কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতার প্রতি আমাদের কোনও সজাগ দৃষ্টি নেই। হাপরের মতো ফোঁস ফোঁস করি। দৈর্ঘ্যের কোনও সমতা নেই, ছন্দ নেই। অনিয়ন্ত্রিত, এলোমেলো। শ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে মন বিক্ষিপ্ত হবে। বিক্ষিপ্ত মনের মননও সুসংযত হয় না। জৈব ক্রিয়াদি সম্ভব হলেও সূক্ষ্ম চিন্তা অসম্ভব। মন যদি সূক্ষ্মে না যায়, বিরাট-স্বরাটের রহস্য বোধ করা যাবে না। Control of the senses. ইন্দ্রিয়মার্গী মনকে একমুখী করতে হবে। মন মাছির চেয়েও চঞ্চল। সেই মনকে নিয়ন্ত্রণের কৌশল নিহিত আছে যোগে। মনকে শ্বাসে নিবিষ্ট কর। শ্বাসকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কর। ধীরে ধীরে চলে যাও 'কেবলি-কুম্ভকে'। প্রত্যক্ষ করো সুষুম্নায় স্থির প্রাণবায়ুকে। মন আভাসিত হোক অনন্ত সত্তায়। তুলসীদাসজিকে স্মরণ করি অবশেষে—

রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।
আপনা মনকো বশ করে সো, সবকো সেরা ওই॥

কথাটা হল, তুমি রাজ্য বশ করেছ, তাই তুমি রাজা, তুমি যুদ্ধ জয় করেছ, তাই তুমি বীর যোদ্ধা; কিন্তু যে মন জয় করেছে, সে যে তোমাদের চেয়েও ওপরে, সে যে রাজার রাজা, বীরের বীর।

মন বলে তাই আমরা করি। সব মানুষই মনের ভৃত্য। মন বললে, সুখের সন্ধান করো, আমরা অমনি ছুটলুম। এখন প্রশ্ন হল, সুখ কাকে বলে! সুখের সঠিক সংজ্ঞাটা কি? টাকা? যশ, খ্যাতি, সম্মান? ভালো বিছানা, সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর বাড়ি? সুখ দুরকম—বৈষয়িক আর আত্মিক। অধিকাংশ মানুষ বিষয়-সুখটাই বোঝেন। ভোগ করব। ভোগের প্রথম শর্ত হল—টাকা। টাকার চাকায় ঘুরছে আধুনিক সভ্যতা। প্রচুর টাকা চাই। যার সামান্য আছে তার বেশি চাই। যার বেশি আছে তার আরও বেশি চাই। তৈরি হল আকাঙ্ক্ষার জগৎ, তৃষ্ণার জগৎ।

ভোগ কে করবে? করবে দেহ। দেহের সীমা আছে। দেহের সামর্থ্য আছে। মনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল; কিন্তু দেহ সবটা নিতে পারে না। প্রচুর খেতে চাই, পেট অপারগ। ভীষণ ফুর্তি করতে চাই, দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া কাল? কালকে কে জয় করবে! যুবক প্রৌঢ় হবে। তারপর বার্ধক্য। প্রতিদিন একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি। চাই, না চাই, চলেছি ভাই একই ঠাঁই। সবচেয়ে বড় তস্কর কে? কাল! জন্মদিন মানে কি? মৃত্যুর দিকে এক বছর করে এগিয়ে যাওয়া! পৃথিবীতে জন্মদিন বলে কিছু নেই। জীবের জন্ম মানে মৃত্যুর ঘড়িটি চালু হওয়া! প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ঘণ্টায় জীবনসূর্য ঢলছে অস্তাচলের দিকে। টেনিসনের সুন্দর একটি কবিতার এক লাইন— Which is today, tomorrow will be yesterday. এইটাই হল সত্য! চিন্তাশীল মন ভাবতে বসল—জন্ম-জরা-বার্ধক্য-মৃত্যুর এই পৃথিবীতে তাহলে সুখ কোথায়। হৃত হতে হতে হৃতসর্বস্ব হওয়াই যদি নিয়তি হয়, আজ আছে কাল নেই এই যদি সত্য হয়, ক্ষণকালের বিন্দু যদি অবিরত মহাকালে ঝরে যায়—তাহলে মানুষ কিসের সন্ধান করবে! হারানোর আতঙ্কে বসে তো পাওয়ার আনন্দ উপভোগ করা যাবে না। মন! তাহলে তুমি কিসের সন্ধান করবে। আনন্দ তো ভোগে নেই। ভোগ তো একটা অভ্যাস। অভ্যস্ত হয়ে গেলে তো আনন্দ থাকে না। দাঁত মাজা আনন্দের? চুল আঁচড়ানো আনন্দের? রোজ অফিসে ছোটা আনন্দের? রোজ ভাত খাওয়া আনন্দের? না। ওগুলো নিত্যকর্ম। অভ্যাসে ঢুকে আছে। হঠাৎ কিছু একটা পাওয়া কি তাহলে আনন্দের? না, ওটা বিস্ময়ের ধাক্কা। ক্ষণস্থায়ী। কিছুকাল পরে মনে মিলিয়ে যাবে।

মন তখন বলবে—আমি এমন একটা কিছু চাই, যা অভ্যাসে হারিয়ে যাবে না। এমন একটা কিছু চাই যা আমাকে প্রতি মুহূর্তে উজ্জীবিত করবে, বেঁচে থাকার একঘেয়েমি নষ্ট করে দেবে। আতঙ্ক দূর করবে। ভয় থেকে অভয় মাঝারে নিয়ে যাবে। সারা পৃথিবী যখন সোনার হরিণের পেছনে ছুটছে—আমি তখন মহানন্দে বসে বসে সেই তামাশা দেখছি। মৃত্যু, বিচ্ছেদ, বেদনা, বঞ্চনা, সুখ, দুঃখ,

যন্ত্রণা আমার পাশ দিয়ে বহে যায়, আমি কিন্তু টলি না, কাতর হই না, হাহাকার করি না। বিশ্ব-চক্রান্ত থেকে আমি মুক্তি চাই না। আমি মনের সেই অবস্থায় যেতে চাই, যে-মন বলে—এহ বাহ্য। আমি হাসতে চাই সেই হাসি—শিশুর অকারণ হাসি। আমার কি আছে, কি নেই, সেই হিসেবের খাতা হারিয়ে ফেলেছি। আপন-পর বোধ চলে গেছে।

কিন্তু আমি জড় নই। আমি চেতন। চেতনার সেই স্তরে আছি, যেখানে কাল আছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়—আদি-অনন্ত এক মহাসমুদ্রের মতো। যেখানে জন্ম আর মৃত্যুর ব্যবধান নেই। যেখানে জীবন জলবিম্ব। সেই আকাশে আছি, যে-আকাশে উদয়-অস্ত নেই! সেই দেহে আছি, যে-দেহ ইন্দ্রিয়ের শাসনমুক্ত। প্রেম হারিয়ে গেছে বিশ্বপ্রেমে। অস্তিত্ব মিশেছে অনন্তে। বিন্দু পড়েছে সমুদ্রে। কর্ম আছে ফল নেই। কর্তব্যের আনন্দ আছে অহঙ্কার নেই। আপনজন আছে আসক্তি নেই। ঘর আছে দেয়াল নেই। জৈবধর্ম আছে আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি অবগাহন করে আছি চেতনসমুদ্রে!

সবই মন। সবই মনের খেলা। মন মনে করায়, তাই আমরা মনে করি। মনে করি, এ আমার ছেলে, ও আমার মেয়ে! এই আমার দেশ, ওটা আমার বিদেশ। মন কেন এমন খেলা খেলে! ওইটাই মনের সংস্কার। জানালার বাইরেই আকাশ, আকাশ গিয়ে মিশেছে মহাকাশে। অসীমেই রয়েছে সসীম। সংস্কার আমার বন্ধনদশার কারণ। ছিঁড়তে পারি, কিন্তু উৎসাহ নেই। খাঁচার সংস্কারে পাখি অভ্যস্ত।

মা শিশুটিকে হাঁটতে শেখায়। মন-শিশুকে কে হাঁটতে শেখাবে। শেখাবে আমার বিচার। বিচার আসবে প্রশ্ন থেকে। প্রশ্ন আসবে কোথা থেকে? গুরুর কাছ থেকে। জীবনে গুরু আসবেন কি-ভাবে? সেইটাই কৃপা। কৃপা কেন আসবে? যদি সংস্কার থাকে তাহলে আসবে। গুরু শেখাবেন বিষয়-পাগলকে মন বাঁধার কৌশল। এ বন্ধনের মজাই হল—বলছি বটে বন্ধন, আসলে তা মুক্তির নামান্তর।

এই বন্ধনের নাম যোগ। চপল-চঞ্চল মনকে বাঁধো সেই চেতন-মনের সঙ্গে। শ্বাস-প্রশ্বাস হল জীবের চপলতা, ইন্দ্রিয় হল অবিচার, দেহ হল দাস, চিন্তা হল মাছি। প্রকৃত অপরাধী হল শ্বাস। সেই শ্বাসের গতি লক্ষ্য করো। শ্বাসই জীবন, শ্বাসই পরমায়ু। ত্রিতন্ত্রীতে তার প্রবাহ। চেপে ধরা যাবে না। বোঝাতে হবে, বুঝতে হবে। দেহকে বসাতে হবে। মনকে রাখতে হবে জপের ফাতনায়। আবেগকে মেশাতে হবে স্থিরতায়। আমাদের হৃৎস্পন্দন হল জপের লয়। শ্বাসের প্রলম্বিত শব্দ হল ধ্যান। ভ্রমণ হল চক্র থেকে চক্রে। হঠাৎ, তারপর একদিন—'আ' আছে 'তঙ্ক' নেই, যোগ হয়েছে 'নন্দ'—আনন্দ।

কেন যোগ? এ বড় সাংঘাতিক প্রশ্ন। বেশ তো আছি রোগে-ভোগে। হঠাৎই যোগের জন্যে কেন উতলা? মানুষের যে অন্বেষণের শেষ নেই। মানুষের যে কোনও কিছুতে তৃপ্তি নেই। ভোগে যে বড় ক্লান্তি। শুধুই বেঁচে থাকাটা যে বড় একঘেয়ে। যে-আনন্দ কোনদিন ফুরোবে না, এমন কোনও আনন্দ আছে না কি? থাকলে কোথায় আছে? কিসে লয় হয়ে আছে? বাইরে আছে না ভেতরে আছে? আমাদের ভেতরেই আছে। নিজেকে জয় করা মানে অখণ্ড আনন্দের সাম্রাজ্য জয় করা। 'মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা।' নিজের সসীমতা, নিজের ক্ষুদ্রতাকে জয় করে 'ভয় থেকে তব অভয় মাঝারে' একবার যদি কোনও রকমে যাওয়া যায় তাহলে মানুষ আর কিসের তোয়াক্কা রাখে? বহু ধরনের ভয়, ভয়ের সাম্রাজ্যের আমরা অসহায় প্রজা। প্রথম ভয় মৃত্যুভয়। আমি হঠাৎ একদিন থাকব না। আমি যতদিন থাকব ততদিন কিভাবে থাকব? দারিদ্র্যে না প্রাচুর্যে? যদি অভাবে থাকি তাহলে প্রতিদিনের ভয়, আজ তো গেল কাল কি হবে? অস্তিত্ব বজায় রাখব কেমন করে? আর যদি প্রাচুর্যে থাকি তাহলেও মহাভীতি, আমার এই প্রাচুর্য থাকবে তো! বহু ধরনের ভয় আমাদের ঘিরে রেখেছে আর আমরা অভিমন্যু হয়ে বসে আছি। বিষণ্ণতাই আমাদের বেঁচে থাকার ট্রফি।

মানুষ মানুষকে পথ দেখায়। বহু যুগ ধরে বহু মানুষের বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা মানুষ কাজে লাগায়, কারণ মানুষের বোধ আছে, বিচার আছে। যে-বিচার থেকে বেরিয়ে আসে সত্য, বেরোয় পথ। সবচেয়ে বড় সত্য হল—Life is an incurable disease. অর্থাৎ ভবরোগ। দেহে যখন একবার প্রবেশ করেছি, তখন আর আমার নিস্তার নেই। কে ঢুকেছে? ঢুকেছে 'আমি'। এই আমি কে? সকলেই তো বলছে আমি। আবার ভাবছে, আমি যখন থাকব না! এক আমি নাই বা থাকল, বহু আমি তো থাকবে। অনন্তকাল ধরে থাকবে। জলে যেমন অসংখ্য বুদ্বুদ, ফোটে, ফাটে। এক যায় তো আর এক আসে। অমোঘ সত্য, মহাসত্য, এই সত্যই মানুষকে দার্শনিক করেছে। ভাবতে শিখিয়েছে, যে-আমির লয় আছে, ক্ষয় আছে, সেই ক্ষণ-আমির কিসের অহঙ্কার, আসক্তি, দ্বেষ-বিদ্বেষ! দেহের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেও, ইন্দ্রিয়ের প্রাচীর টপকে মানুষের দর্শনের চেষ্টা—কোন্ বৃহতের বুদ্বুদ এই দেহ। এই আমি রূপ। এই দেহঘট—একটি জলপূর্ণ ঘট জলেই নিমজ্জিত। বাইরেও জল ভেতরেও জল। ঘট অর্থাৎ উপাধিটি চূর্ণ করে দাও, দেখবে বাইরের জল আর ভেতরের জল সব একাকার। এই অনুভূতিই হল মানবজীবনের উচ্চাবস্থা। এইখানেই মহাজীবনের উপস্থিতি। এইখানেই সেই দর্শন, যা আমরা পাই স্বামীজীর এই রচনায়;

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাবে ডোবে পুনঃ 'অহং'-স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসগোচরম্', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

এই যে 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্', এই উপলব্ধিই আমাদের চির-অন্বেষণ। ধন-জন-মান-সম্মান নয়, উৎসের অনুসন্ধান। কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই! উৎসের সঙ্গে যোগ। এরই নাম যোগ। এরই নাম চৈতন্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না।' কোথায় সেই কুলকুণ্ডলিনী? 'মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। চৈতন্য হলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এইসব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরই নাম মহাবায়ুর গতি। তবেই শেষে সমাধি হয়।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—'শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে জ্ঞানের কথা চর্বণ করলে! কি হবে!'

তাহলে কি চাই? একটা ব্যাকুলতা। আমি চাই। তাঁকে চাই। 'নতমুখে আছে সেই শিবসোহাগিনী।' জীবের কুণ্ডলিনী চক্র নতমুখী। বিষয়মুখী, দেহমুখী, ভোগমুখী। তাঁকে ঊর্ধ্বমুখী, অমৃতপায়ী করতে হবে। উপায়! 'মা, মা রবে মনসুখে মন ত্রিতন্ত্রী একবার বাজাও রে! তব বীণার ঝঙ্কারে জাগাও তাহারে।' তারপর! কথা শেষ, আস্বাদন। সমাধি পাঁচ প্রকার—পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষীবৎ, তির্যগবৎ। সে আলোচনা আর নয়। সাধন করো। অনুভব করো। ভব-রোগের আরোগ্য। আর ভব-রোগ-বৈদ্যম্ কে? গুরু। গুরু কি করেন? অভিমন্যুকে শেখান ইন্দ্রিয়-ব্যূহ ভেদের কৌশল।

কেন চাই

কি দরকার? বেশ তো আছি। একটা চাকরি জুটে গেছে। রোজগার নেহাত খারাপ নয়। সংসার টংসার হয়েছে। পুত্র-পরিবার নিয়ে বেশ তো আছি। আর আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা ভোগ্যবস্তু দানে অকৃপণ! এপাশে টেলিভিশন, ওপাশে ফ্রিজ, এধারে কুলার, ওধারে মাইক্রোওভেন! কত রকমের প্রসাধনী, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, দ্রুতগামী যানবাহন! কত কথা, কত বক্তৃতা, কত রকমের ইজ্‌ম—

মার্কসিজম, টেররিজম! তবু কেন হেরি তব বিষণ্ণ বদন! প্রাণখোলা হাসি কই! কোথায় সেই ভালোবাসা! কোথায় মানুষে মানুষে সেই মধুর সম্পর্ক!

বড় ভয়, ভীষণ নিঃসঙ্গ আমি! আমার বাইরের খোলসটা আপাতত বেশ তোয়াজে আছে। বিষয়সম্পত্তির মূল্যায়ন করলে হতাশ হবার তেমন কারণ নেই। একটা বাহারী বাসস্থান, আধুনিকা সহধর্মিণী, ইংলিশ মিডিয়ামে ছেলেমেয়ে, ছোট একটা গাড়িও আছে। ব্যাঙ্কে ব্যালেন্সও বাড়ছে। কিন্তু আমার ভীষণ ভয়।

এই সবই পেয়েছি আমি নিজেকে ভাঙিয়ে। রেসের ঘোড়ার সঙ্গে আমি আমার কোনও তফাত খুঁজে পাই না! প্রতিযোগিতার প্রাঙ্গণে অন্য অনেক ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়চ্ছি আমি। থামার উপায় নেই। থামলে ছিটকে বেরিয়ে যাব। আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সারা সংসার গেল গেল করে উঠবে। অবশেষে অপদার্থ বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। গরুর সঙ্গে আমার তফাত কোথায়! যতক্ষণ দুধ, যতদিন দুধ, ততদিনই আমার খাতির। শুকনো সম্পর্কের কোনও দাম নেই। কিসের কদর? কদর তোমার শিক্ষার। শুধু শিক্ষা হলে হবে না, প্রয়োজন অর্থকরী শিক্ষার। কদর কিসের? তোমার উপাধির। কদর কিসের? তোমার ঐশ্বর্যের। সমস্ত সম্পর্কই বাইরের, অন্তরের সম্পর্ক বলে কিছু নেই। সবই মৌখিক। 'কেমন আছ?' 'ভালো আছি, আপনি কেমন?' 'ভালো'। সমস্ত মেলামেশা এই তিনটি কথার ওপর তেপায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। এর বেশি এগোতে গিয়ে ঠোক্কর খেতে হয়। এর বেশি প্রয়োজন নেই। সভ্যতা হল দন্ত প্রদর্শনের সভ্যতা। মুচকি হাসি, কিছু প্রথা, কিছু সংস্কার। বাইরেটা খুব সাজানো গোছানো, ভেতরে স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, দ্বেষ। এই সভ্যতা কেন, সব কালের সব সভ্যতাই মনস্ট্রাস, ডেমনিক। মানুষ একটা কথাই জানে—ব্যবহার। ব্যবহার করো—পাপোশের মতো, যন্ত্রের মতো, তোয়ালের মতো, জুতোর মতো। যতদিন ব্যবহারে আসে ততদিনই সম্পর্ক, নয়তো ছ্যাতরানো টুথব্রাশের মতো ছুঁড়ে ফেলে দাও। এই নির্মম সত্য আমরা সহ্য করতে পারি না বলেই নানারকম মোহ সৃষ্টি করি—প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, পিতা, মাতা, বন্ধু, ভ্রাতা। নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে সংসার করি। অতঃপর যখন বুঝতে পারি, তখন বেলা শেষ, যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

কত বছর আগে রামপ্রসাদ এই গানটি লিখেছিলেন :

ভেবে দ্যাখ মন, কেউ কারও নয় মিছে ভ্রমো ভূমণ্ডলে;
ভুলো না দক্ষিণাকালী, বদ্ধ হয়ে মায়াজালে।।
যার জন্য মরো ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে
সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে।।
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই মানে
সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে।।

সেই সময় আর এই সময়, চিত্র কি কিছু পালটেছে! সত্যের কি কোনও হেরফের হয়েছে! হয় নি। মিথ্যাকে সত্য ভাবাটাই মানুষের নিয়তি। যাঁরা সত্য দর্শন করেছেন, যাঁরা এই পেঁয়াজটিকে চিনেছেন, তাঁদের ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়াটাই আমাদের মতো মানুষের ধর্ম। পেঁয়াজ কেন? খোসা ছাড়াও, পরতে পরতে পরতে। অবশেষে কী রইল! কিছুই না। তবু আমাদের কত লম্ফ-ঝম্প! সত্য এত উজ্জ্বল, এত বিশাল, ধারণা করতে গেলে আমাদের মাথা ঘুরে যাবে, আমরা ভয় পেয়ে যাব। সেই কারণেই সব কিছুকে আমরা ছোট করে নিতে চাই। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে নিতে চাই। পূর্ণকে আমরা চাই না। আমরা অল্পেই সন্তুষ্ট। বিশাল জগৎ অচেনা। বিশালতর ব্রহ্মাণ্ড ভীতির কারণ। ছোট্ট শহর, ছোট্ট গ্রাম, ছোট্ট পরিবার, ক্ষুদ্র গৃহ, পরিচিত জন, তাহলেই আমরা নিরাপদ। সন্তুষ্ট, সুখী। এই গণ্ডি ভেঙে গেলেই আমরা দিশাহারা, বিচলিত। বন্ধনেই আমাদের সুখ। আমরা মুক্ত হতে চাই না, চাই বদ্ধ হতে। পৃথিবীতে আসাটাই হল পতন। এই বদ্ধতা থেকে ওঠার চেষ্টাটাই হল আসল খেলা। তিনি ফেলে দিয়ে দেখতে চান ক'জন উঠে আসতে পারে! এইটা তাঁর খেলা। আমরা সেই খেলার সাথী। রামপ্রসাদ বড় সহজ করে এই খেলাটি বর্ণনা করে গেছেন :

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি, ভব-সংসার-বাজার মাঝে,
ওই যে আশা-বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥
কাকগণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ি
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি
ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি ॥

এই হল কথা, লক্ষের দুটো একটা কাটবে, অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত হবে। সবাই যদি কেটে বেরিয়ে যায় তাহলে তো আকাশ ফাঁকা। লীলাই তো শেষ হয়ে যাবে। সেই কারণেই বুদ্ধির হরেক রকমফের। অনেক স্তর! বিষয়েরই কত ভেদ! তবে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়, নীচ, মধ্যম, উচ্চ! শিশ্নোদরেই ঘোরে মন, সেইটাই হল জীবলোক। কোনভাবে তুলতে পারলে একটু ওপরেই জ্ঞানলোক। সেইখান থেকে আর একটু চেষ্টা করলেই পরাজ্ঞানলোক। এই স্তরেই সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা। অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাস। মায়ার চর্মাবরণে সামান্য চিড়। সেই ফাটলে উঁকি মারে আলো। তার অন্য বর্ণ। ভেসে আসে শব্দ। সেই শব্দ অন্য। তার ঝঙ্কার আলাদা। অন্য দৃশ্য। মায়ার জগৎ কি লোভ দেখায়! এই পরাজগতের আকর্ষণ বড় ভয়ঙ্কর। একটু আভাসেই মানুষের সব ভুল হয়ে যায়। সেই জগৎ কোটি যোজন দূরে নেই! পাশেই আছে! সামান্য একটা পর্দার আড়ালে! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন সুন্দর উপমা, আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ

কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না! কারণ মাঝখানে সীতা মায়ার ব্যবধান। এই মায়া পথ না ছাড়লে পরমাত্মারূপী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখা যায় না, যদিও তিনি আড়াই হাত দূরেও নয়, আছেন আমাদের অন্তরে!

কেন পাই না; কারণ আমরা ইচ্ছে করি না! আমরা বিষয় নিয়ে মজে আছি! নির্বিষয়ে যাওয়ার ইচ্ছাটাই আমাদের নেই! অভ্যাসের জগৎ, সংস্কারের জগতের বাইরে যেতে আমাদের ভয়, আমাদের অস্বস্তি। অনুবর্তনে আমরা একপ্রকার মৃতই! দিন আসে, দিন যায়, জীবিকার চাকায় একইভাবে আবর্তিত হই! অভ্যাসের দাস আমরা! এও একধরনের মাধ্যাকর্ষণ! পৃথিবী থেকে যেমন জীব পালাতে পারে না, সেইরকম মধ্যশরীরের মাধ্যাকর্ষণে মনও পালাতে পারে না। একেই বলে শিশ্নোদর পরায়ণতা। শরীরের নিম্নভাগ পৃথিবী! অধিকাংশ মানুষের মন নিম্নাভিমুখী! জাগতিক কার্যকারণের সঙ্গে জড়িত! দেহসুখকেই তাঁরা মনে করেন কাম্যসুখ! তাঁদের সুখের সংজ্ঞা অর্থ ও বিত্তের দ্বারা পরিমিত। তাঁদের কাছে সুখ হল গাড়ি, বাড়ি, বড় চাকরি, মোটা রোজগার। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুই সত্য। অতীন্দ্রিয়লোকের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করতে চান না। তাঁদের কাছে জীবনের সত্য দুটি—জন্ম আর মৃত্যু। আর এর থেকে যে জীবনদর্শন তা হল—খাও-দাও ফুর্তি করো।

বুদ্ধি থেকে বোধ, বোধ থেকে বিচার। গীতা বলছেন, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্॥ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কী? নিশ্চয় জ্ঞান, সাংখ্যবুদ্ধি, একনিষ্ঠ বুদ্ধি। সকাম বুদ্ধির উলটোটা। অব্যবসায়ী বুদ্ধি হল, অস্থির বুদ্ধি। বহির্মুখী, সকাম জীবের বুদ্ধি, যা বহুশাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী। বুদ্ধি অস্থির থেকে যখন স্থির হয় তখনই আসে বিচার। তখনই আসে ভাবনা। ভাবনা তৈরি করে চেতনা। সেই কারণেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অমর্ত্যলোকে প্রয়াণের পূর্বে একটি কথাই বলে গিয়েছিলেন—তোমাদের চৈতন্য হোক।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি জাগবে কীভাবে? এইখানেই আসছে যোগ। যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ একা, একেবারে একা। স্থানটি নির্জন। সমস্ত কল-কোলাহলের বাইরে। কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই, পেতেও চাই না কিছু। দেহ সংযত, মন সংযত। অন্তরে নিবিষ্ট। এইবার শুরু করা যাক! সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বয়ং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ আসনে স্থির। দেহ সরলরেখায় স্থাপিত। মেরুদণ্ড, চিবুক ও মাথা খাড়া একটি লাইন। দৃষ্টি নাসিকাগ্রে স্থির। শ্বাস-প্রশ্বাস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সরু সুতোর মতো। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো মন অচঞ্চল, ভাবনাশূন্য। যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা। নিষ্কম্প শিখার ধারণা

ভ্রূমধ্যে। দুই ভুরুর মাঝখানে নাকের ওপর স্থির। মনে আর কোনও চিন্তা নেই। যোগী আসনে স্থির। লাভ-ক্ষতি, হানাহানি, ওঠাপড়ার পৃথিবী চলেছে বাইরে। আপাতত তার খবর রাখার প্রয়োজন আমার নেই। স্পর্শান কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ। প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ। প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি সমান করেছি। রোধ করেছি, কুম্ভ করেছি। অর্থাৎ কুম্ভক হয়ে গেছে মনঃসংযমের কারণে।

তাহলে কী হবে : বলা যাবে না। করে দেখতে হবে। হয়তো একটা বিস্ফোরণ হবে। জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন হবে—Burst of vibrant light and energy. 'আজি যত তারা তব আকাশে / সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।। নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া, মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে, তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত আমারি অঙ্গে বিকাশে।।'

এষ ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাম্ প্রাপ্য বিমুহ্যতি।।

কথা হল—জগৎ এখন ভোগে রোগে এতই জটিল, যোগের কথা শুনবে কে। এই তো বেশ এই জ্বলেপুড়ে মরা! উট কাঁটা গাছ খায়, দু'কশ বেয়ে রক্ত ঝরছে। তবু খাবে! কারণ এতেই উটের আনন্দ।

পরমানন্দ

দেহেই মুক্তি, দেহেই বন্ধন। এই দেহ দিয়েই মুক্তির সাধনা। মুক্তির অর্থ কী? মুক্তি মানে কী মৃত্যু? না, মৃত্যু মানে অনুপস্থিতি। আমি নেই। আমি নেই মানে জগৎ নেই। কিন্তু এক আমি গেলেও অন্য আমি রয়ে গেল। এমনও হতে পারে এই আমি ফিরে এল অন্য আমি হয়ে। সুতরাং জগৎ ছাড়া অলৌকিক পারলৌকিক মুক্তির সন্ধান যোগীর লক্ষ্য নয়। যোগীর চিন্তা অতিশয় ইতিধর্মী। পজেটিভ। তাঁরা আদৌ বলবেন না, জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য। যোগী বলবেন, জগৎ সত্য। জগৎকে ধরতে হবে। দেহ দিয়েই ধরতে হবে। যেমন মীন আর জল। মাছ যদি বলে জলের বাইরে মুক্তি খুঁজবো, মুক্ত সে হবে, তবে সে মুক্তির নাম মৃত্যু। জীব জীবজগতে নিমজ্জিত থাকবে, জাগতিক নিয়মে স্বাভাবিক চলা-ফেরাকে মেনে নেবে গণিতের Axiom-এর মতো। জগৎকে ধরে উঠতে হবে, যেমন লতা একটি অবলম্বনকে ধরে ওঠে, ভূমি থেকে আকাশে, পাদপীঠের অন্ধকার থেকে নিরালম্ব আলোকে।

সীমা থেকে অসীমে যাওয়াই যোগের লক্ষ্য। ঘটাকাশ আর আকাশের মাঝে ঘটের সূক্ষ্ম ব্যবধানটুকু উপলব্ধি করাই যোগীর উদ্দেশ্য। যোগ মানে যোগ। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ। বিরাট বিশ্ব খেলছে আমারই দেহে। আমারই দেহে খেলে যায় নদীর তরঙ্গ। বয়ে যায় বাতাস। মাথা তোলে উত্তুঙ্গ হিমগিরি।

নিজের সমস্ত ঘেরাটোপ খুলে বিশ্বশান্তিকে নিজের মধ্যে খেলতে দেওয়ার সাধনাই হোল যোগ। লীন হয়ে যাবার নামই যোগ।

ক্ষুদ্র আমি দিয়ে বৃহৎ আমিকে ধরতে হবে। ক্ষুদ্র আমি আছে কোথায়? ক্ষুদ্র দেহে। সেই দেহ কেমন? তার অনেক দুর্বলতা। জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যুর বশীভূত। সসীম এক মাংসপিণ্ড। শ্বাসে আর প্রশ্বাসে বাঁধা তার জীবনছন্দ। অন্নগত প্রাণ। উদরসর্বস্ব। কয়েকটি জৈবপ্রবণতার দাস—আহার-নিদ্রা-মৈথুন। কতকগুলি জৈব প্রবৃত্তিই প্রবল—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। যোগী এই জৈব অবস্থাকে কখনই অস্বীকার করবেন না। কল্পনার দেবত্ব তিনি বিশ্বাস করবেন না। কোনওরকম Euphoria কোনওরকম দৈবশক্তিতে তাঁর আস্থা নেই; কারণ তাতে ভুল হতে পারে। ঠকে যাবার সম্ভাবনা থাকে—Psychological cheating। দুটো জিনিস বুঝতে হবে—লক্ষণাক্রান্ত আর লক্ষণারোপিত। যেমন ম্যালেরিয়া হলে শরীর কাঁপে। শরীর কাঁপলেই কি বুঝতে হবে ম্যালেরিয়া হয়েছে! যেমন সমাধি হলে চোখ উলটে যায়। চোখ ওলটালেই কি সমাধি হয়। তার মানে আমাকে যদি ম্যালেরিয়া সত্যই ধরে তাহলে আমি কাঁপবই। আমার সেই কাঁপুনি কেউ ধরে রাখতে পারবে না। নিজের ওপর কিছু আরোপ করে নিজেকে ঠকাবো না। আমি আক্রান্ত হব। আমাতে ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে সমস্ত লক্ষণ। যোগ হল বিজ্ঞান। তুমি করবে, তুমি ধরবে। প্রথমে তুমি নিজেকে ধরবে। তারপর তোমাকে ধরবে। কে ধরবে? অলৌকিক কোনও শক্তি নয়। ভূত, প্রেত, দানব, দেবতা নয়। তোমাকে ধরবে বিশ্বশক্তি। তোমার সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে পাওয়ার হাউসের। এই করার নামই ক্রিয়া। ওয়্যারিং করা। ইলেকট্রিশিয়ান লাইন-টাইন সব করে দিলেন। মিটার বসে গেল। এইবার যেই মেন সাপ্লাইয়ের সঙ্গে যোগ হয়ে গেল, জ্বলে উঠল আলো। গর্জন করে উঠল পাম্পের মটোর।

দেহকে রেডিওর মতো টিউন করতে হবে, তবেই না ধরতে পারবো দেশ-বিদেশের বার্তা। এইবার নেমে আসি আমার সাধারণ অবস্থায়। আমার আমি ছড়িয়ে আছে, এলোমেলো হয়ে আছে। আমি নিয়ত নিজের শক্তিকে ইতর কাজে খরচ করছি। আমি বেঁচে আছি আমার বাইরে। আমি আমার ভেতরে নেই। আমি আছি আমার বাইরে। যাকে আমি consciousness বলছি, সেটা আদপেই আমার জ্ঞানাবস্থা নয়, আমার হারিয়ে যাবার অবস্থা। এই অবস্থায় আমার চলে যাবে। আমি চলব না। আমাকে চালাবে। পরিস্থিতি আমাকে ঠেলতে ঠেলতে নিজের গতিপথে তুলে দেবে মৃত্যুর No-man's Land-এ।

কেন আমি পরিস্থিতির দাস? কারণ আমি দেহগত। দাসত্ব দেহের। দেহকে পরিস্থিতির দাসত্ব থেকে বের করে আনাই যোগের প্রথম লক্ষ্য। পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে হলে, নিজেকে গুটিয়ে নিতে হবে শামুকের মতো। ছড়ানো মনকে তুলে

আনতে হবে অন্তঃপুরে। নিজের ভেতরটাকে দেখতে হবে। এই দেখার নাম যোগ। অন্তরবলোকন। আমি আমাতেই থাকব। কিন্তু কী নিয়ে থাকব? বাইরে যে আমার অনেক কিছু ছিল—রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ। ভেতরে আমার কী আছে? আরে, ভেতরেই তো আছে আসল জিনিস! যা না থাকলে কিছুই থাকবে না! তোমার শ্বাসকে ধরো। শ্বাসকে অনুসরণ করো। শ্বাসে ওঠো, শ্বাসে নামো। আবিষ্কার করো দেহস্থ ছ'টি চক্রকে। মনের ছ'টি অবস্থা। মূলাধার থেকে সহস্রার। দেখবে শ্বাসের প্রবাহপথ নাসিকা নয়। মেরুদণ্ডেই তার ওঠা নামা। চেষ্টা করো শ্বাসকে কেন্দ্রস্থ করতে, সুষুম্নায় আনতে। চক্রে চক্রে দর্শন করো ওঁকে। প্রতি ধাপেই ক্রিয়া। কোথাও কোনও কর্মহীন কল্পনা নেই। তুমি করবে, তুমি ধরবে, তুমি পাবে। কী পাবে? নির্ভর, মুক্ত, ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা। পাবে পরমানন্দ। কিন্তু সেই শক্তি-কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করার জন্যে প্রয়োজন হবে যোগী-পুরুষ।

উপসংহার

এই গ্রন্থটি পরমহংস হরিহরানন্দের অপূর্ব এক দান। গুরুকৃপার সমতুল্য গ্রন্থকৃপা। জীবের দুটি সম্পদ—দেহ আর মন। দেহ হল রথ, মন হল সারথি। আর আরোহী হলেন আত্মা। আত্মার আবার দুটি উপস্থিতি—জীবাত্মা আর পরমাত্মা। আত্মা ত অবিভাজ্য, এক। দুই আসে কি করে? যেমন বাইরের ঘর আর ভেতরের ঘর। বাবু কখনও বাইরের ঘরে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসেন, পাঁচ কথায় মেতে থাকেন। যখন ভেতরের ঘরে থাকেন তখন অন্যরূপ।

আমরা আমাদের আত্মস্বরূপের খবর রাখি না। মন মাতিয়ে রাখে। ইন্দ্রিয়ের স্পর্শে মনের হরেক রঙ। তিনটি রং-ই প্রবল! রঙের জগতেও তিনের প্রাধান্য। শিল্পীরা বলেন—Primary colours লাল, নীল আর হলদে। মনেরও তিন রং—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এই তিনের মিশ্রণেই যত রং—বস্তুর রং, মনের রং।

হরিহরানন্দজী যে-যোগের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তা অতি প্র্যাকটিক্যাল। জীবন আর জগৎকে অস্বীকার করতে গুহাবাসী হতে হবে না। আলোড়িত এই জীবনভূমিতেই আসন পাততে হবে। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে রথে দাঁড় করিয়ে কুরুক্ষেত্র ভূমিতে যোগশিক্ষা দিয়েছিলেন—টল, অটলের খেলা। বাইরের পরিস্থিতি যা-ই হোক অটল থাকতে হবে। টলে গেলে চলবে না।

কে টলে? মন!

হরিহরানন্দজী মনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করছেন—সদা অস্থির। মন চঞ্চল ত শ্বাসও চঞ্চল। তাহলে শ্বাসকে ধরে মনের হদিস পেতে হবে। শ্বাস স্থির, নিয়মিত মাত্রাচিহ্নিত, তাল আর লয়ে বাঁধা, তখন মনও স্থির। শ্বাসের এই ক্রিয়ার নাম

'ক্রিয়াযোগ'। এর জন্যে প্রয়োজন 'গভীর শ্বাস'। এই শ্বাসে মন সংযুক্ত হবে অতিজাগতিক চৈতন্যমণ্ডলে। মন চলে যাবে অনন্তের বলয়ে। সসীম আর অসীমের সংযোগসেতু এই 'সুদীর্ঘ শ্বাস'। শ্বাসের সূত্র ধরে মনের আরোহণ। দেবলোকে গমন।

এই যোগাযোগে মানুষ তার স্বরূপ জানতে পারবে। পৃথিবীর যাবতীয় চক্রান্ত হল মানুষের অস্তিত্বকে মৃত্তিকায় পরিণত করা। সেই চক্রান্ত থেকে মুক্তি পেতে হলে চৈতন্যের দীপ্তিকে প্রখর করতে হবে। একেই বলে মুক্তি, মোক্ষ, আত্মস্বরূপ জ্ঞান। আমি মৃত্তিকার কীট নই, আমি জ্যোতির্ময় অনন্তের আনন্দ-স্ফুলিঙ্গ।

হরিহরানন্দজী বলছেন, প্রার্থনা, ভক্তি, এসব পথে গতি অতি মন্থর। যাঁকে খুঁজছি, তিনি বাইরে নেই, তাঁর অবস্থান অন্তরে। সেই মনোলোকে অবিরাম ঝড় চলেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ইন্দ্রিয়াসক্ত এলোমেলো তাণ্ডব। নিজের প্রকৃত স্বরূপ হল ঈশ্বর। শ্বাসের পথে বোধের দেবায়ন। এই হল মূলতত্ত্ব।

তিনি বলছেন, কালকের জন্যে অপেক্ষা করো না। আজই শুরু করো, এখনই। পথ কি বহু দূরগামী? না। যাত্রা বলে কিছু নেই, আছে 'প্রবেশ'। শ্বাসের চাবি দিয়ে মরচে ধরা তালাটি খোলো। ঘর আমার, বিভ্রান্তিকর তালা আমিই ঝুলিয়েছি, চাবি আমারই পকেটে। অভাব শুধু চেতনার। দর্শনের ভ্রান্তি। মননের ভ্রান্তি।

হরিহরানন্দজী সুন্দর একটি সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন—শ্বাসই তোমার ঈশ্বর। কেন? শ্বাস বন্ধ হলেই তুমি ও তোমার জগতের অবসান। সেই 'এক'-ই বহু নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চালাচ্ছেন। একই হাপরের বাতাস। মূল্যবান প্রশ্ন—এ শ্বাস কার শ্বাস! এই প্রশ্নের সমাধানে মৃত্যুর উত্তর—শ্বাস তোমার নয়, স্রষ্টার। মাত্রা মেপে দিয়েছেন। শেষ হলেই অস্তিত্ব শেষ।

গুরু হরিহরানন্দ বলছেন—আজই বসে পড়। শ্বাসে মনোনিবেশ করো। তোমার মেরুদণ্ডটি হল শ্বাসদণ্ড। অধোদেশ হল পৃথিবী, সংসার। ঊর্ধ্ব—যত উঠবে, যতটা উঠবে—অনন্তের চিত্র, অনুভূতি, উপলব্ধি। নিত্যে বসে অনিত্যের জ্ঞান।

গাছের ডালে ফল। বৃন্তে ঝুলে আছে। অনন্তের বৃক্ষে শ্বাসের বৃন্তে জীব, ফলের মতো দুলছে। খসে পড়ব—সসীমে নয় অসীমে।

এই অপূর্ব গ্রন্থ কৃপালু গুরুস্বরূপ।

ওহি দেশকো হামে জানা

মৃত্যু সম্পর্কে যখন নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি জানতে চাই জীবনের পরপারে কী আছে? তখন তিনি বলেছিলেন, 'নচিকেতা, তুমি আমার কাছে যা কিছু জানতে চাও, আমি সব তোমাকে বলব। কিন্তু সেই অদৃশ্যলোকে, মানুষ যেখানে গমন করে—সেই লোকের কথা তুমি আমার কাছে জানতে চেয়ো না। তোমাকে আমি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য দান করে দিচ্ছি, যত ভোগের উপকরণ আছে, সব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। অজস্র অশ্ব দিচ্ছি, সুন্দরী রমণী দিচ্ছি, প্রচুর অর্থ দিচ্ছি, রাজসিংহাসন দিচ্ছি—কিন্তু তুমি আমাকে মৃত্যু সম্বন্ধে, জীবনের পারে মৃত্যুর সেই অন্ধকার-লোকে কী আছে, সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন কোরো না।

এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যে সত্যটি আবিষ্কার করা গিয়েছিল, সেটি হচ্ছে—আমরা যে আত্মায় বিশ্বাস করি, সেই আত্মার জন্মও নেই। মৃত্যুও নেই। এ কথা মুখে বলা খুবই সহজ, অভ্যাস করা খুব কঠিন। সেজন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে তোমরা মৃত্যু-সচেতন হও। কেন মৃত্যু-সচেতন হতে বলছেন তিনি? এজন্যই বলছেন যে মানুষ বড় জীবনকে আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসে। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, পথের পাশে পড়ে থাকা কোনও ভিখারী হোক—সে কিন্তু চায় বাঁচতে। কিন্তু বাঁচা শব্দটার অর্থ আমরা কেউই জানি না। বাঁচা মানে আমরা যেটুকু ব্যাখ্যা করি বা বুঝি, সেটুকু হচ্ছে একটা অভ্যাসের চাকায় আবর্তিত হওয়া। রোজ সকাল আসবে, রাত্রি আসবে—আবার সকাল আসবে, আবার রাত্রি আসবে—এবং আমরা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবো। মৃত্যুর দিকে মানে কি? অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া—অর্থাৎ আমি যে আমিটাকে আঁকড়ে ধরে আছি। এই আমির পরিচয়—আমি যে নাম বলি, আমার যে ঠিকানা বা জীবিকা বা পেশা ইত্যাদি যেমন বস্তু দিয়ে এই আমিটি গঠিত হয়েছে। সেই আমিটি আমি হারিয়ে ফেলবো একদিন। এবং সেইটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। আমার ছিল—এই ছিল, সেই ছিল, বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, অমুক ছিল, তমুক ছিল। এই আমার, আমার—এই বস্তুগুলোকে ছেড়ে চলে যেতে আমাদের বড় বেদনা হয়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন এটি হচ্ছে বাপু তোমার কাঁচা আমি—যে আমি বলে যে এই পৃথিবীতে আমার যে সমস্ত বস্তু চিহ্নিত হয়ে আছে। সেগুলি আমার এবং এতে কারোর অধিকার নেই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এটা তোমার কাঁচা আমি। তার কারণ, এর কোনটিই তোমার নয়। তুমি যে মুহূর্তে

চোখ বুজবে—কোথায় তোমার বাড়ি, কোথায় তোমার গাড়ি, কোথায় তোমার ঘর? কোথায় তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার? কিছুই নেই। যদি জীবনের প্রথম স্তরেই আমরা এই ধারণাটি করে নিতে পারি যে এই পৃথিবীতে যা কিছু আমি আমার বলে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি, সেগুলোর কোনটিকেই আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। অতএব, এগুলোর সবই হচ্ছে অনিত্য বস্তু। অনিত্য বস্তু মানে কি? আমার অনস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে যেগুলোর আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। সেই বস্তুগুলোকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অনিত্য বস্তু। আর কোন্ বস্তুটি নিত্য? যে বস্তুটি আমি চলে যাবার পর থাকবে, যে বস্তুটিতে গিয়ে আমি হাজির হব; সেই বস্তুটি নিত্য। তিনি কে? সেই নিত্যবস্তুটি কি?

বলছেন, তিনি ঈশ্বর।

কেন ঈশ্বর? কেমন ঈশ্বর?

বললেন, তাঁকে তুমি রূপে কল্পনা করো। তাঁর অনেক রূপ আছে। তুমি যদি জ্ঞান দিয়ে তাঁকে ধরতে চাও, তাহলে তিনি জ্ঞানী। তিনি কখনও সাকার, কখনও নিরাকার। এবং এই ঈশ্বরকে তুমি যে আখ্যায়ই ভূষিত করো না কেন, তিনি ঠিক সেই রূপেই তোমার সামনে হাজির হবেন। তোমার বিশ্বাসে ঠিক সেই ভাবেই ধরা দেবেন। এবং তুমি যদি নাস্তিকও হও, সেই নাস্তিককেও তিনি বলছেন ঘোরতর আস্তিক। তার কারণ, তিনি একটা জিনিসকে ফেলে দিতে চাইছেন—সেটা হচ্ছে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। অতএব আমার সংগ্রাম তাঁর সঙ্গে।

নাস্তিক কিন্তু ঘোরতর আস্তিক। কারণ, প্রতি মুহূর্তে সে ঈশ্বর, ঈশ্বর করছে। যে জিনিসটাকে সে অস্বীকার করতে চাইছে, প্রতি মুহূর্তে সেই জিনিসটাই তার মনে আসছে। অতএব আমরা যদি মনে তাঁকে স্মরণ করতে চাই, তাহলে দেখা যাবে যে একজন নাস্তিক ঈশ্বরকে অনেক বেশি ধারণ করে আছে আস্তিকের চেয়ে। সেইজন্য ঈশ্বরই হচ্ছেন নিত্য বস্তু। আর বাকি সব অনিত্য বস্তু—যা থাকবে না। আমি চলে যাবার পরেও আরও অসংখ্য আমি থাকবে। আমি না থাকলেও এই পৃথিবী থাকবে। আমি না থাকলেও এই রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধের জগৎ থাকবে। এবং এটাকে যদি আমরা ব্রহ্মের মায়া বলি, এটিও থাকবে। অর্থাৎ আমার থেকেও এদের স্থায়িত্ব কিছুটা বেশি। কিন্তু তা বলে এটিও নিত্য নয়। তার কারণ, এমন একটা বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসতে পারে, যখন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভূমণ্ডল সমস্ত কিছু মুছে যেতে পারে। তখন কে থাকবে?

এইভাবে যদি আমরা ছাড়াতে ছাড়াতে এগোতে থাকি তাঁর দিকে, তাহলে দেখা যাবে—তিনি থাকবেন। এবার এই 'তিনি'র ব্যাখ্যা নানাভাবে করা যেতে পারে। যেমন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, একই মাছ—মা জানেন কোন্ ছেলের

পেটে কেমন সহ্য হবে—কারোকে ঝাল দিয়ে করে দিলেন, কারোকে ঝোল করে দিলেন, আবার কারোকে ভাজা করে দিলেন। ঈশ্বরকে যদি আমার এরকম একটি মৎস্যরূপে কল্পনা করি! তাহলে যার পেটে যেরকম সহ্য হয়, তিনি সেভাবেই তাঁকে গ্রহণ করুন। কিন্তু এই বিশ্বাসে স্থিত হতে হবে এবং এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা বোঝায় যে কিছুই থাকছে না। তাহলে কোথায় যাচ্ছি আমরা এগুলিকে ছেড়ে? সেই অনিশ্চিত অন্ধকার-লোকে যাচ্ছি। সেখানে আলো আছে কি নেই। সেই জগতের রং কি রকম। সেখানে কোনও প্রাণী আছে কিনা। সেখানে অসংখ্য আত্মার কলরব আছে কিনা—কিছুই জানি না। যেদিন যাব, সেদিন জানব। ফিরে এসে কারোকে জানাতে পারব না। এই অনিশ্চিতলোকে যাওয়া—বৌদ্ধধর্মে যাকে বলা হচ্ছে একধরনের নির্বাণ, বুদ্ধদেব সেজন্য এটিকে জীবনে অভ্যাস করতে চেয়েছিলেন। মরে গিয়ে তুমি নির্বাণ লাভ করো এটি আমি চাই না। তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে এই সত্যটিকে ধরে নাও—মৃত্যুশরণ হও—যে আমি মারা যাবার পর আর কিছুই থাকবে না। অতএব এই সত্যটাকে তোমরা ধারণ করো এবং এই সত্যটিকে যদি আমরা ধারণ করতে পারি—আমাদের সমস্ত সংশয় চলে যাবে, আমাদের সমস্ত ভয় চলে যাবে। আমাদের সমস্ত ভ্রান্তি চলে যাবে, আমাদের আশঙ্কা, আতঙ্ক সমস্ত কিছু নির্মূল হয়ে যাবে। তার কারণ আমাদের একটি মাত্র ভয়, সবচেয়ে বড় ভয়—সেটি হচ্ছে মৃত্যুভয়। সেই মৃত্যুভয় থেকে আমি নিজেকে তুলে আনতে পারি, নিজেকে যদি নিজের সঙ্গে বিচার করে বোঝাতে পারি যে আমি বলে কোনও বস্তু নেই। 'আমি'-র যদি বিচার এভাবে করি আমার হাত, আমার পা, আমার চোখ আমার কান। আমার বলা, আমার কওয়া, আমার নৃত্য, আমার ঝগড়া—তাহলে এর মধ্যে আমি কোথায় আছি? কোথাও নেই।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, 'আমি' কেমন জানো? একটা পেঁয়াজ। প্রথম খোসাটি ছাড়াও। ভেতরে লালচে, হালকা লাল রঙের একটি খোসা বেরলো। সেটিকে ছাড়িয়ে ফেলো—তারপরে পরতে পরতে সাদা খোসা বেরোবে। এবং শেষকালে দেখবে তোমার হাতে কিছু নেই।

আসলে এই আমিগুলো হচ্ছে মানুষের কতকগুলো ইন্দ্রিয়ের স্বার্থের সংঘাত। পাঁচটা বদমাইশ বজ্জাত লোক আমাদের ভেতরে বসে আছে। তারা যখন রাগাচ্ছে, রেগে যাচ্ছি। যখন ছোটাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছি। যখন মনে হচ্ছে, ওর হয়ে গেল আমার হল না। তখন ভেঙে পড়ছি—যেটাকে একালে বলা হচ্ছে frustration। এগুলো সমস্ত হচ্ছে ওই পাঁচ বাঁদরের কাজ। আর ভেতরে যে শুদ্ধসত্তা বসে আছে—সেটি সব মানুষের মধ্যে আছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সেই এক-কে ধরে পরপর শূন্য বসাও। দশ হবে, একশ হবে, হাজার হবে, লাখ হবে, কোটি হবে—একটাকে সরিয়ে নাও, সব কটা শূন্য ঝুলবে। শূন্য মানে শূন্যই।

কিছুই নেই। অতএব ঈশ্বরকে আগে ধরো, তোমার ভেতরে যিনি বসে আছেন, তাঁকে ধরো—ধরে তাঁর ওপরে জগতে যত ব্যাপার আছে, সেগুলোকে পাশাপাশি বসাও। তাহলে একটা অর্থ খুঁজে পাবে। জীবন উজ্জ্বল হবে—বলেই বলছেন, মৃত্যু দুঃখের নয়।

স্বামীজী বলছেন, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, লিঙ্গও নেই। আত্মার অসুখ নেই কিছুই নেই। এই আত্মজ্ঞান নচিকেতা যমরাজের কাছে চেয়েছিলেন এবং পেয়েওছিলেন। বলেছিলেন, সেই আত্মজ্ঞান তুমি যদি লাভ করতে পারো, যে বস্তুটি তোমার ভেতরে বসে আছে—অজর, অমর, অক্ষয়। যে বস্তুটি তোমার ভেতরে বসে বসে শুধু দেখছে তুমি কি কেরামতি করছ। কিন্তু কোনসময়েই তোমাকে বাধা দিচ্ছেন না—তার কারণ তিনি চান যে তুমি ঠেকে শেখ। তোমার জ্ঞান দিয়ে তুমি আমাকে চেনো। সেজন্য ঠাকুর বড় সুন্দর একটি উপমা দিতেন, সেটি হচ্ছে গরুর বাচ্চা। পেট থেকে যখন পড়ে তখন সে দৌড়য়। প্রথমবার পড়ে যায় ধপাস করে। তারপর আবার উঠে আবার দৌড়য়। আবার পড়ে যায়। এবার উঠে আবার একটু দৌড়য়। আবার পড়ে যায়। এবার তৃতীয় দৌড়ে সে যখন শুরু করে, তখন সে আর পড়ে না। আমাদেরও হচ্ছে তাই। আমরা প্রথম প্রথম এই বিশ্বাসে স্থিত হই যে একটু গিয়ে আমরা পড়ে যাই। পড়ে যাই না তাতে ক্ষতি কি। আবার আমরা উঠব। আবার আমরা দৌড়ব। আবার পড়ে যাব। আবার দৌড়ব। আবার পড়ে যাব। শেষকালে একটা জায়গায় স্থির হয়ে আমি আমাকে ধরে হাঁটতে শিখব। আমরা কেউ আমার আমিকে বিশ্বাস করি না। যে যেমন নাচায়, সেইরকম নাচি। যে যেমন বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়, সেই বিশ্বাসে আমরা পথ খোঁজার চেষ্টা করি।

কিন্তু সেটা কিরকম হচ্ছে? একটা অন্ধ লোক আরেকটা অন্ধ লোককে চালাবার চেষ্টা করছে এবং দুজনেই খানায় গিয়ে পড়ছে। এজন্য সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জ্ঞানের অন্বেষণ যদি করতে চাও, তাহলে জ্ঞানের কাছে যাও। প্রকৃত জ্ঞানী কে? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, জ্ঞান এক। ঈশ্বরই বস্তু, বাকি সব অবস্তু। ঈশ্বরে বিশ্বাসই হচ্ছে জ্ঞান, ঈশ্বরে অবিশ্বাসই হচ্ছে অজ্ঞান। ঈশ্বর কে? বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে ঈশ্বর কখনও আত্মা। ঈশ্বর কখনও রূপ, ঈশ্বর কখনও আমার ইষ্ট, ঈশ্বর কখনও আমার গুরু। ঈশ্বর কখনও আমার জ্ঞান, ঈশ্বর কখনও শক্তিশালী, মহা ঐশ্বর্যশালী কোনও একটি অস্তিত্বের প্রতিভাস। সে কারণে ভগবানকে যে যেমন ভাবে, তিনি সেই ভাবেই তার কাছে দেখা দেন।

ঠাকুর একটি গল্প বলতেন, বহুরূপীর গল্প। একদিন ঝাউতলায় গিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরের ঝাউতলায়। গিয়ে দেখছেন সেখানে একটা অদ্ভুত ধরনের প্রাণী ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। তিনি সেটিকে দেখছেন। বাগানের মালী বললেন, জানেন, ওই

যে প্রাণীটিকে দেখছেন, ওর নাম হচ্ছে গিরগিটি। ও কখনও বেগুনী, কখনও লাল, কখনও সবুজ। কখনও ছাই ছাই রঙ। ওর যখন যা ইচ্ছে, সেই রঙ ধারণ করতে পারে। কিন্তু আসলে ও বস্তুটি হচ্ছে একটি গিরগিটি।

ঈশ্বরও সেইরকম। বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন। কিন্তু একমাত্র সত্তা, একমাত্র সত্য হচ্ছে, তিনি রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধের অতীত। আমরা তাঁকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চোখ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারব না। আমাদের হাত দিয়ে তাঁকে ধরতে পারব না। আমাদের ভক্তি দিয়ে হয়তো তাঁকে কাছে টেনে আনতে পারি। যে কারণে কলিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বারে বারে বলেছেন, নারদীয় ভক্তি হচ্ছে একমাত্র পথ যে পথ দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি।

ঈশ্বরের কাছে গেলে কি হবে? সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হবে এবং তুমি আনন্দ লাভ করবে। তার কারণ, তিনি হচ্ছেন আনন্দস্বরূপ। তিনি রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ সমস্ত সৃষ্টি করেছেন নিজের আনন্দের জন্য। মানুষ—তুমি সেই আনন্দ লাভ করার চেষ্টা কর। তুমি যদি চিরদুঃখে নিমজ্জিত হও, তুমি যদি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হও, সেটা তাঁর দোষ নয়—তোমার বেঁচে থাকার ভুল। সেই কারণে বারে বারে এই কথাটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন—তোমরা সংসার করো ক্ষতি নেই। স্ত্রী, পুত্র, কলত্র নিয়ে সেখানে বসবাস করো কোনও ক্ষতি নেই। তার কারণ, সন্ন্যাস বড় কঠিন বস্তু। সমস্ত কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে সাচ্চা সন্ন্যাসী হওয়া বড় কঠিন। তুমি যদি কাশীতে গিয়ে পুঁইমাচা দেখ, হিমালয়ের গুহায় গিয়ে যদি সুন্দরী রমণীর ধ্যান করো—তাহলে সেখানে গিয়ে তোমার লাভটা কি হল? সেই কারণেই তিনি বলছেন, তোমরা সংসারে থাকো। আমি তোমাদের জন্যেই এসেছি এই পৃথিবীতে। অন্য সব অবতাররা এসে বলেছেন, সংসার ত্যাগ করো। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ত্যাগ করে বেরিয়ে চলে যাও। আমিই একমাত্র অবতার কিনা তা জানি না। ঠাকুরকে অবতার বললে তিনি রেগে যেতেন। তিনি বলতেন, আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ। তোমাদের কাছে এসেছি। কেন? কারণ, আমি সত্য লাভ করেছি। সাধনপথে, সমস্ত সাধন করে আমি জেনেছি—যত মত তত পথ।

আর কি জেনেছি? জেনেছি সংসারে কি করে থাকতে হয়, তার কায়দা। এইবার বলছেন, আমি তোমাদের কেন দিতে চাইছি? বললেন, 'আমাকে ওরা সবাই অবতার বলছে। অবতারদের একজন। অবতারদের গুণ কি জানো? অবতাররা হচ্ছে বাহাদুরি কাঠ। নদীর জলে একটা কাঠ ভেসে যাচ্ছে। সামান্য সাধারণ কাঠ হলে, তার ওপর যদি কেউ চেপে বসে, সেটি ডুবে যাবে। কিন্তু বাহাদুরি কাঠ বলে একটা কাঠ আছে, তার ওপর যদি হাজারটা লোকও চেপে বসে সেই কাঠ চেপে ভেসে ভেসে নদী পাড়ি দিতে পারে।

সেই কারণে, অবতাররা যে জ্ঞান লাভ করেছেন, সেই জ্ঞান নিজের মোক্ষের জন্য নয়। আত্মনমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। জগতের হিতের জন্য আমি কাজ করে যাব এবং তাইতেই আমার মোক্ষলাভ হবে। তাইতেই আমার আত্মার মুক্তি ঘটবে। সেইজন্য আমি সন্ন্যাসী হইনি। আমার কোনও সংঘ-সংগঠন নেই। আমি কিচ্ছু করিনি। আমি বারোটি ছেলেকে বাছাই করে নিয়ে এসেছি পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য। আর তোমরা যারা গৃহী, তাদের জন্য আমার একটিমাত্র বার্তা আছে। সেটা হচ্ছে—সংসারে থাকো, খুব ভালো করে সংসার করো। কিন্তু সৎ থেকো। সত্যবাদী থেকো। আর এইটুকু জেনে রেখো, সংসার অনিত্য। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার—সকলকে এমন ভাব দেখাবে যেন তারা তোমার কত আপনার আর তুমিও তাদের কত আপনার। কিন্তু মনে মনে জানবে, কেউ কারোর নয়। একমাত্র তিনিই তোমার। এই জ্ঞানটি লাভ করবে। ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে সংসারে থাকবে।

একথা বলেই বলছেন, জলে অনেক হাঙর, কুমীর, মকর আছে। নামলেই তারা গ্রাস করবে তোমাকে। উপায়টা কি? উপায় হচ্ছে, হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে ওরা কিছু করতে পারবে না। সে হলুদ তুমি পাবে কোথায়? সংসারের জলে যে এত নক্র মকরাদি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জন্য তুমি কোন্ হলুদ মাখবে? কুকমী বা ডাটার গুঁড়ো মশলার হলুদ?

না। বিবেক হলুদ। বিবেক হলুদ গায়ে মেখে নামো। এবং সে বিবেকের একটি মাত্র বক্তব্য, সে বারে বারে রোজ একবার করে প্রশ্ন করবে—দিন শেষ হয়ে যাবার পর বিছানায় শোবার সময়—তুমি আজকের দিনটা সৎ ছিলে? আজকের দিনটা সত্যবাদী ছিলে সারাদিন? কারোর কোনও ক্ষতি করোনি? কোনও অসৎ চিন্তা করোনি? মনের মধ্যে এমন কোন ভাব এনেছিলে কি যাতে তোমার মৃত্যু হতে পারে? তোমার আমি এমনি কুঁকড়ে আছে, সেটি আরও সংকুচিত হতে পারে?

যদি আমি বুক ফুলিয়ে অন্ধকার ঘরে আমার বিবেককে বলতে পারি—না, আজকের দিনটি আমি সুন্দরভাবে খরচ করেছি, তখন তিনি বলবেন, বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু যত সেয়ানাই হও না কেন, কাজলের ঘরে থাকলে একটু কালি গায়ে লাগবেই। বলেই বলছেন, তা একটু আধটু লাগুক না, তাতে ক্ষতি কি? একেবারে কালো ভূতটি হয়ে যেয়ো না। তাহলে আমি যে তোমাদের আপন করে নিয়েছি, আমার গর্ব খর্ব হবে। আমি তোমাদের জন্য এসেছিলাম। তোমাদের জন্য সংসারী হয়েছিলাম। সমস্ত সাধন করে সত্য বস্তু উপলব্ধি করে তোমাদের এই সত্য জানিয়ে যাচ্ছি—শাস্ত্র যা বলেছে, তা সব সত্য কথা। সমস্ত সাধন পথই গিয়ে শেষ হয়েছে সেই উপলব্ধিতে—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম উপলব্ধি। গিয়ে আমরা হাজির হচ্ছি কোথায়? যেখানে গেলে এই জীবনের জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, ক্ষয়—কোনও

কিছুই থাকবে না। যেকথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—ওরে ভয় নাই তোর ভয় নাই। ভয় নাই তোর ভয় নাই।

সমস্ত মানুষ যে পথ দিয়েই যাক, একই সত্যে উপনীত হয়েছে যে technique of life, বেঁচে থাকার কৌশলটাকে রপ্ত করে তবে সংসারে প্রবেশ করো। তা নাহলে চাকরি পাবি না। চাকরি না হলে টাকা পাবি না। টাকা না পেলে বৌ পাবি না। বৌ না পেলে গাড়ি পাবি না। গাড়ি না পেলে হেঁটে যেতে হবে বা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন আমরা বলি।

সেইরকম, আমরা যে সংসারে এসেছি, তিনি যে কায়দায় আমাদের বাঁচতে না বলেছেন, যদি আমরা তাঁর কথা না শুনি, সংসারের সমস্ত ষড়যন্ত্রে আমরা মরার আগেই মরে যাব। অচিরেই আমাদের যৌবন চলে যাবে। আমাদের উজ্জ্বলতা চলে যাবে। এবং তখন যদি একদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেঁকে বলি—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে একটা লোক উঠে এসে মাথায় এক গাঁট্টা মারবে। বলবে, পেটের অসুখে ভুগিস, অ্যামিবায়োসিস, জিয়াডিয়াসিস—বারান্দায় দাঁড়িয়ে শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমি সোহম্। আমি ব্রহ্ম এই যদি বলো সেটা মানায় না।

তাহলে কি করতে হবে? আমাকে এমন একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হতে হবে যেখানে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, আমি পেয়েছি এমন একটা জিনিস যে জিনিসটি আমাকে দান করে গেছেন অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী বলছেন, অবতার আগে অনেকে এসেছেন। পরেও আরও অনেকে আসবেন। কিন্তু এই রামকৃষ্ণ অবতারে সমস্ত অবতার সন্নিবিষ্ট হয়েছেন।

মহাপ্রভু সংসার ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। জরা, মৃত্যু, ব্যাধি ইত্যাদি দেখে বুদ্ধদেব চলে গিয়েছিলেন নির্বাণ লাভ করার জন্য। Jesus Christ প্রেম বিতরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাপ আর পুণ্যের বিভাজন করেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এসে বললেন, পাপও নেই, পুণ্যও নেই। তাহলে কে আছে? নিষ্কলুষ আত্মা আছে। পাপ, পাপ বললেই তোমার মধ্যে পাপ প্রবেশ করবে। স্বামীজীকে দিয়ে বলালেন New-negative thoughts। No নেই নেই। Always yes, yes—আছে, আছে।

এবং তিনি বলে গেলেন, শোন নরেন, নেই নেই করতে করতে সাপের বিষও নেই হয়ে যায়। সেইজন্য প্রতিদিন যেন আমরা নিজেকে বলি, আমার আছে—সিন্দুকে টাকা নেই, ব্যাঙ্কে টাকা নেই, ভালো চাকরি নেই, পায়ে ছেঁড়া জুতো—তবু আমার আছে। কি আছে? আমার ভেতর অনন্ত শক্তি আছে—যে শক্তি দিয়ে দুঃখের সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, তুমি আমার কি করবে? কিছু করতে পারবে না। কারণ, দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে না। আনন্দ,

তুমি আমাকে কত নাচাবে? আমি নাচব না। তার কারণ, পৃথিবার ষড়যন্ত্র আমার জানা আছে। এটা একটা cycle-এর মতো। আনন্দের পরেই দুঃখ। দুঃখের পরেই একটু আনন্দ। এক ছটাক আনন্দ। আবার দুঃখ। এবং সব যদি আমরা ভাগাভাগি করে দেখি, দেখব দুঃখটাই অধিক।

এই পৃথিবী এত সুন্দর যেখানে এত সবুজপত্ররাজি বিরাজ করছে। যেখানে এত অবতার পুরুষরা এসেছেন, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ৩৯ বছরের জীবনটা আমাদের জন্য বেলুড়মঠে গঙ্গার ধারে বিসর্জন দিয়ে গেছেন—এই কি তাঁদের প্রতি আমাদের প্রতিদান? আমরা তো বিশ্বাসঘাতক, আমরা ভণ্ড—যদি তাঁদের কথা না শুনে চলি। সেজন্য কথামৃত থেকে একটি পরিচ্ছেদ এখানে বলছি, যেটি খুব সুন্দর।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণ-পূর্বের ঘরটির (দক্ষিণেশ্বরে যাঁরা গেছেন, তাঁরা কল্পনা করুন ঠাকুরের ঘরটিকে—পশ্চিমে গঙ্গা, উত্তরে ঝাউতলায় রানী রাসমণির বাগান, পূর্বদিকে সেই সদর গেট, আর দক্ষিণদিকে মায়ের মন্দির বালির ব্রীজ এবং কলকাতার দিক) বারান্দায় বসে আছেন। সেখানে কে কে আছেন? রাখাল—পরে যিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী হয়েছিলেন। লাটু আছেন—অদ্ভুতানন্দজী হয়েছিলেন। আমাদের মাস্টারমশাই আছেন। হরিশ আছেন। এইসব ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসে আছেন। মজলিশ হচ্ছে। এঁরা সমাজের বিভিন্ন দিক থেকে এসেছেন। এঁদের অভাব আছে, পরিবার আছে, দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে—কিন্তু সমস্ত কিছু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে আনন্দময় হয়ে উঠেছে। ঠাকুর বলতেন না যে, একটা গামলায় নীল জল গোলা আছে। আর একটা গামলায় লাল আছে। আর একটাতে হলদে আছে। যে-কোন সাদা কাপড় ওই গামলা-গুলোতে ফেল—নীল হবে, লাল হবে, হলদে হবে। সেরকম আনন্দময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যে যাবে, সে আনন্দের স্পর্শ পাবে। সেখান কোনও দুঃখ নেই। যদিও পরবর্তীকালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য আধুনিক ব্যাধি, ক্যান্সারটি গলায় ধারণ করেছিলেন। এটিও তিনি বলেছিলেন, আমি সব একটু একটু করে রেখে যাব তোমাদের উপমার জন্য। যখন তুমি দেহকষ্টে ভুগবে, তখন আমার কথা ভাববে। কাশীপুরে উদ্যানবাটিতে আমার অন্ত্যলীলার সময় আমি কী যন্ত্রণা ভোগ করেছি। অতএব তুমি, আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করেছি এবং যা দিয়ে সেটাকে উল্লম্ফন করে চলে গেছি। সেই কায়দাটি রপ্ত কর। সেটা হচ্ছে কি?

ঠাকুরকে যখন বলা হল যে আপনি মাকে গিয়ে বলুন না, আপনার কথা তো তিনি শোনেন। ওই গলার ক্ষতটি যদি সেরে যায়, তাহলে আপনার আরও কথা শুনতে পাব। ঠাকুর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, কি, এই হাড়-মাসের খাঁচার

জন্য আমি মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে বলব যে আমাকে আরও কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখো? তাঁর কাছে আমি জ্ঞান চেয়েছি, তাঁর কাছে আমি শুদ্ধাভক্তি চেয়েছি—এবং সেখানে, দক্ষিণেশ্বরে এসে একহাতে টাকা একহাতে মাটি নিয়ে বলেছি, টাকা মাটি, মাটি টাকা—তা ফেলে দিয়েছি। সেজন্য অনেকে উপহাস-ব্যঙ্গ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেননি যে ধাতুর স্পর্শে তাঁর দেহে একটা বিকার আসে। সেইজন্য, ঠাকুর একদিন কলকাতায় গেছেন, তখন নরেন্দ্রনাথ চুপি চুপি এসে তাঁর বিছানার তলায় একটি টাকা রেখে দিয়েছিলেন। ঠাকুর ফিরেছেন, কিচ্ছু জানেন না তিনি। বিছানায় বসেই 'উফ্' করে লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটি তুলে দেখা গেল সেখানে একটি টাকা। নরেন্দ্রনাথ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, খুব লজ্জা পেয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, বেশ করেছিস, বেশ করেছিস। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি। বাজিয়ে নিবি। সত্য কথা বলছে না ভণ্ডামি করছে! সেইজন্যই না তিনি নরেন্দ্রনাথ।

সেই কারণেই যাঁরা ঠাকুরের কাছে এসেছেন, তাঁরা সব কিছু—এইসব খোলস, অষ্টপাশ বাইরে ফেলে দিয়ে চলে এসেছেন। মজলিশ হচ্ছে—সেখানে কি হচ্ছে? একজন বৈষ্ণব ভক্ত এসেছেন নীলকণ্ঠের দেশ থেকে। নীলকণ্ঠ বর্ধমানে থাকতেন। ঠাকুর তাঁর গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর একটি গান প্রায় সবাই শুনেছেন—

"কতদিনে হবে আমার সে প্রেমসঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম, বলব হরিনাম।"

নীলকণ্ঠের গান শুনতে শুনতে ঠাকুর বলতেন, সিদ্ধপুরুষ। তিনি গান গাইলে ঠাকুর নৃত্য করতেন। সেই দেশ থেকে একজন এসেছেন। এসে একটি বড় কীর্তন করেছেন। করার পরে আরও একটি গান গেয়েছেন। সেটি হচ্ছে মানুষ-পূজা সম্পর্ক। কি করে ঈশ্বরকে মন্দির ছাড়া, ইষ্ট ছাড়া আমরা মনের মতন পুজো করতে পারি। গান শেষ হয়ে যাবার পর আমাদের ঠোঁটকাটা ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন, এ গান কিরকম যেন একরকম লাগল?

গান সম্পর্কে ঠাকুর খুব সচেতন ছিলেন। যে সমস্ত গানের বাণীউদ্দীপক নয়, ঠাকুর সেগুলি সম্বন্ধে বলতেন এ সমস্ত কি ভ্যানতাড়া গান গাইছে, মা তোমার জিভ লকলক করছে, মা তোমার গলায় মুণ্ডমালা, মা তোমার এক হাতে খড়্গ এক হাতে বরাভয়, মা তোমার পায়ের তলায় শিব পড়ে আছেন, মা তুমি আমাকে অমুক দাও, এ সমস্ত কি গান?

সেইজন্য তিনি বলছেন, এ গান কিরকম একটা লাগল।

হাজরা মশাই ব্রহ্মবাদী। তিনি বলছেন, এ গান সাধকের নয়। এ গান কোনও সাধক লেখেননি। এ হচ্ছে জ্ঞানদীপ। জ্ঞানের প্রতিমা। কোনও জ্ঞানী চেষ্টা

করেছেন এ গান লেখার। সেজন্য মন স্পর্শ করছে না। ঠাকুর তখন বলছেন, আমার যেন কেমন বোধ হল, গানটা যেন কেমন কেমন লাগল। আগেকার গান সব ঠিক ঠিক। মানে ইনি যে গান গাইলেন, তার আগের রচয়িতারা যে সমস্ত গান গেয়েছেন, সে গানগুলো কিন্তু ঠিকঠিক। বলে বলছেন, পঞ্চবটীতে ন্যাংটার কাছে আমি গান গেয়েছিলাম। ন্যাংটা হচ্ছেন তোতাপুরী। ঠাকুরের গুরু, পুরী সম্প্রদায়ের, যিনি ঠাকুরকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। তাকে তিনি ন্যাংটা বলতেন। বলছেন, ন্যাংটার কাছে আমি গান গেয়েছিলাম। বলে বলছেন, কি গান গেয়েছিলাম? গেয়েছিলাম—'জীব সাজো সমরে। রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।'

যে-কথা বলা হচ্ছে। সংগ্রাম হচ্ছে মৃত্যুর সঙ্গে। তিনি ঢুকছেন তোমার ঘরে। জীব সাজো সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। আরেকটা গান গেয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে : 'দোষ কারও নয়গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।' আমরা প্রায় সবাই কিন্তু স্বখাত সলিলেই হাবুডুবু খাচ্ছি। বলেই বলছেন—ন্যাংটা অত জ্ঞানী। বাংলাও জানে না। মানে না বুঝেই কাঁদতে লাগল। মানে গানটা এমনই ভাবে লেখা, আর এমনভাবে গাইলাম যে, সে কোনও ভাষা বোঝে না আমার, তাও মানে না বুঝেই সে কাঁদতে লাগল। বলেই বলছেন, এসব আমি কেমন ঠিক ঠিক কথা বলেছি বলো। একথা বলে একটি গানের উদাহরণ দিচ্ছেন—ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্ত কারি রে, নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি রে।

ইংরাজি যাকে aliteration, সেটি দেখুন এখানে কি সুন্দর। ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্ত কারি রে, নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি রে। অর্থাৎ সেই যমরাজকে চিন্তা করো। যেমন, নচিকেতা চেয়েছিলেন, সত্যটিকে লাভ করে নাও তাঁর কাছ থেকে। মৃত্যুকে ধরে ফেলো একবার গলা টিপে। তাহলে কি হবে? ভয়ান্ত হবে। ভয় আর থাকবে না। একথা বলেই বলছেন, পদ্মলোচন আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাঁদতে লাগল। তিনি ছিলেন বিশাল পণ্ডিত। বর্ধমান রাজসভার পণ্ডিত ছিলেন পদ্মলোচন। ঠাকুর তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এবং পরবর্তীকালে ঠাকুরকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। আড়িয়াদহ থেকে তিনি ঠাকুরকে বলে গেলেন, "আমার দেহ যাবার সময় হয়েছে ঠাকুর, আমি বারাণসীতে চললাম। এতকাল জ্ঞানের চর্চা করেছি। সেখানে তোমার নির্দেশমত দু-একটি ভক্তির চর্চা করব। ভক্তি-ধন লাভ করে তাঁর কাছে যাব!

এরপরে আহার করলেন ঠাকুর। এবার একটু বিশ্রাম করছেন। মেঝেতে বসে আছেন কথামৃতকার মাস্টারমশাই, আর অন্যান্য ভক্তরা। নহবতে রোশন-চৌকি বাজছে। তখন দক্ষিণেশ্বরের নহবতে সানাই বাজত। বাজনা শুনতে শুনতে ঠাকুর আনন্দ করতেন। ঠাকুর বলতেন, দূর থেকে ভেসে আসা সানাইয়ের শব্দ

শুনলে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। সাধকমাত্রেই জানেন যে একমাত্র সঙ্গীত অতি সত্বর ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, অতি সত্বর আমাদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে দিতে পারে। যেকথা ঠাকুর পরবর্তীকালে বলেছেন। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত না হলে আমরা কোনও সময়েই নিজের স্বরূপকে খুঁজে পাব না। সেজন্য যখন নহবত থেকে রোশন চৌকির, সানাইয়ের শব্দ আসছে—শুনে ঠাকুর আনন্দ করছেন। শ্রবণের পর ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন, ব্রহ্মই জীবজগৎ হয়ে আছেন। ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানী। ঠাকুর ব্রহ্মে স্থিত। সমাধি থেকে ফিরে আসতে পারেন যিনি, তাঁকেই বলা হয় অবতার। ঠাকুরের বন্ধু ছিলেন কুমার সিং। তিনি পাশেই কোম্পানির বারুদখানায় পাহারাদারের কাজ করতেন। তিনি নানান পন্থী ছিলেন। তিনিই প্রথম ঠাকুরকে অবতার বলে স্বীকার করেছিলেন। কেউ যখন করেননি, সাধক অবস্থায়।

তিনি বলেছিলেন, আমার গুরু নানককে দেখেছি সমাধি অবস্থা থেকে ফিরে আসতে পারেন। আর বন্ধু তোমাকে দেখছি, তুমি পারো। অতএব তুমিও অবতার। একথা বলে তিনি নানকের একটি ছবি দিয়ে গেছিলেন।

সেইজন্য তিনি বলছেন যে, ঠাকুর ফিরে এসেছেন ব্রহ্মদর্শন করে। এবং আমাদের জানাচ্ছেন যে ঐ পাশ থেকে এটাকে যদি দেখা যায়, আমরা তো এ-পাশ থেকে ওটাকে জানার চেষ্টা করি অসম্ভব, ঐ পাশ থেকে যদি এটাকে জানি, তাহলে দেখা যাবে—ব্রহ্মেরই মায়া, মায়ার ব্রহ্ম নয়। তিনি এই জীবজগৎ, এত স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-বন্ধুবান্ধব সব তৈরি করেছেন। এগুলো হচ্ছে তিনি। এসবই তাঁ-তে আছে। বলেই বলছেন, শুনবে, ব্রহ্মই সমস্ত জীবজগৎ হয়ে আছেন। ঠাকুর বলছেন, কেউ বলবে ঐ অমুকস্থানে হরিনাম নিক।—অনেকে আছেন—ভয়ঙ্কর ভক্ত। ঠাকুরকে এসে বললে ঠাকুর খুশি হন। বললেন, অমুক জায়গায় গেলাম, গিয়ে দেখলাম সেখানে কোনও হরিনাম নেই। বলবামাত্রই তিনি দেখলেন, যেই বললেন, ঠাকুরের মধ্যে অবিশ্বাস এল না।

তিনি দেখলেন, তিনিই সব জীব হয়ে আছেন। সমস্ত তিনিই হয়ে আছেন। তিনিই সমস্ত জীব হয়ে আছেন। কেমন? যেন অসংখ্য জলের ভুড়ভুড়ি। যদি একটা একটা খালি জলের বোতলকে এক বালতি জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে ভুরভুর ভুরভুর করে জলের অনেক bubbles বা বুদ্বুদ বেরোচ্ছে। সেগুলি তো জলেরই বুদ্বুদ। সেরকম ব্রহ্মের যে এত সমস্ত হয়েছে, এগুলো তিনিই হয়েছেন। তা না হলে আমরা আসছি কোথা থেকে? সেই কারণে ঠাকুর বলছেন, আমার দর্শন হল সঙ্গে সঙ্গে। বলবামাত্রই আমি দেখলাম তিনিই সব জীব হয়ে আছেন। যেন অসংখ্য জলের ভুড়ভুড়ি। জলের বিম্ব অর্থাৎ জলেরই বুদ্বুদ। আবার দেখছি, যেন অসংখ্য বড়ি বড়ি। যেমন সেকালে মায়েরা,

ঠাকুমা-দিদিমারা ছাদে বড়ি দিতেন। একখানা কাপড় বিছিয়ে দিয়েছেন। আর ডালের বড়ি টুকটুক টুকটুক করে দিয়ে যাচ্ছেন। এক ছাদ বড়ি। বড়ি মানে কি? প্রত্যেকটি বড়ির মধ্যে যে বস্তুটি আছে, সেটি ডাল। সমস্ত জীবের মধ্যে, জীব নামক বড়িটির মধ্যে যে বস্তুটি আছেন, তিনি ব্রহ্ম। ঠাকুরের এসব দর্শন হচ্ছে।

ঠাকুর এটা কোথা থেকে পেলেন? এই যে সবাই বলেন যে তিনি তো কিছু পড়েননি! সেজন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কাণ্ডটি যা করেছিলেন, সেটি জ্ঞানস্বরূপ। তাঁকে স্কুলেও যেতে হয়নি। কলেজেও যেতে হয়নি, ডক্টরেট করার জন্য থিসিসও লিখতে হয়নি। এই দুটি কথা তিনি গীতার থেকে বললেন এবং বেদান্ত সূত্র থেকে বললেন।

তাঁরা বললেন, আপনি যে দুটি কথা বললেন, সে দুটি কথা অনেক পণ্ডিত অনেক চিন্তাভাবনা করে এইসব গ্রন্থে লিখে গেছেন।

ঠাকুর নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছেন। বলছেন, ওদেশ থেকে বর্ধমানে (তিনি কামারপুকুর থেকে আসছেন, তখন যেভাবে আসতে হত হেঁটে, গরুর গাড়িতে নানা কাণ্ড করে) যখন আসছি, আসতে আসতে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম। দেখি, জীবরা এখানে কেমন করে খায়, থাকে?

এই হচ্ছেন ঠাকুর। নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, ঈশ্বর রইল, সমাধি রইল। ভারতবর্ষটাকে আগে দেখে আয়। কোন্ মানুষ কোথায় কিভাবে জীবন কাটাচ্ছে! আমার একটা পরিকল্পনা আছে। আমি তো সিদ্ধাই করতে পারিনি। আমি চলে যাবার পর, তোর মধ্য দিয়ে সেই কাজটা করব। সেটা হচ্ছে কি? জাতির জাগরণ। Uplift of the nation। বলেই বললেন, শোন নরেন্দ্রনাথ, খালি পেটে ধর্ম হয় না।

যাইহোক, সেই মাঠের পানে গিয়ে ঠাকুর কি দেখলেন? দেখলেন—মাঠে পিঁপড়ে চলেছে। সার সার পিঁপড়ে মাঠ দিয়ে চলেছে। তিনি বলছেন—সঙ্গে সঙ্গে আমার ধারণা হল, সব স্থানই চৈতন্যময়। তিনি মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, ছোট ছোট কীটাণুকীট পিঁপড়ে মাঠের ওপর সার দিয়ে পিলপিল করে চলেছে। আমাদের কথায় আছে—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের শরীর। যেই আমরা ছাই হয়ে যাব, মাটি হয়ে যাব। বাইবেলও এই কথা বলছেন। তুমি ধুলোর থেকে উঠেছ, ধুলোতেই মিশিয়ে যাবে।

ঠাকুর বলছেন, যেই পিঁপড়ে দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল সমস্ত স্থানই চৈতন্যময়। এবার হাজরা মশাই ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি বৈদান্তিক। ঠাকুর তখনও বলছেন, কিরকম যেন, নানা ফুল যেন নানা মানুষ। আর পাপড়ি থাক থাক—তাও দেখছেন। এক একটা ফুলে অনেক পাপড়ি থাকে। দেখা যাবে, থাকে থাকে পাপড়ি উঠছে। বড়, তারপরে ছোট, তারপরে ছোট, তারপরে আরও ছোট। তিনি বলছেন, এই জীবজগৎও সেইরকম। মানুষের পর মানুষ, তার পর

মানুষ, তারপর মানুষ—যেন সহস্রদল পদ্মের মতো। পাপড়ি থাক থাক—তাও দেখছেন। ছোট বিম্ব, বড় বিম্ব সমস্ত আমার দর্শন হয়ে গেছে। এই সকল ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, কথা বলতে বলতে ঠাকুর মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলছেন, আমি হয়েছি, আমি এসেছি। আমি হয়েছি, আমি এসেছি—একথা তো আমরাই বলি। যে কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে—যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না জন্মেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আমিটা জন্মায়নি। আমি জন্মেছি বলা যাবে না। জন্মাবার পর আমার আমি জন্মেছি। কিন্তু একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, আমি যখন জন্মেছি আমি একদিন মরবই। একথাটা আমি লিখে দিতে পারি। কারণ, পৃথিবীতে যে মানুষই এসেছে, সে মানুষই মরেছে। অতএব আমি মরব। সেজন্য ঠাকুর বলছেন, আমি হয়েছি, আমি এসেছি—কে আমি? কোন্ আমি? —সেই ব্রহ্ম। তিনি হয়েছেন, তিনি এসেছেন। কিজন্য এসেছেন? বহু কণ্ঠে বহু জীবন দিয়ে তিনি জীবনস্বরূপটি বুঝবেন এবং বোঝাবেন।

ঠাকুর বলছেন যে, তিনি চান খানিকটা দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি হোক। তিনি চান বৈচিত্র্য। তিনি চান অদ্ভুতধরনের সৃষ্টি। তার জন্য তাঁর আনন্দ। এবং বলছেন, সেজন্য তিনি হয়েছেন, তিনি এসেছেন। এই কথা বলেই একেবারে সমাধিস্থ হলেন, সমস্ত স্থির।

অনেকক্ষণ সম্ভোগের পর বাইরের একটু হুঁস আসছে। এইবার বালকের মতো হি-হি করে হাসছেন। ঠাকুর বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে মানুষের তিনটি অবস্থা হয়। হয় সে জড়বৎ হয়, না হয় পিশাচবৎ হয়, না হয় বালকবৎ হয়।

ঠাকুর বালকবৎ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হি-হি করে হাসছেন। হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করছেন। সেই দৃশ্যটা কল্পনা করুন। দক্ষিণেশ্বরে সেসময়ে ওই ছোট্ট ঘরটিতে সবাই হাঁ করে দেখছেন যে সেই অমেয় পুরুষটি হা-হা করে হাসছেন। একটু আগে তিনি সমাধিস্থ ছিলেন। একটু আগে কি অসম্ভব ভালো ভালো কথা বলেছেন—যে কথা কোনও জ্ঞানীও বলতে পারবে না। যে কথা বলা চলে একমাত্র উপলব্ধি হলে।

এবার তিনি হাসছেন আর হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন। অদ্ভুত দর্শনের পর চোখ থেকে যেমন আনন্দ জ্যোতি বাহির হয়, সেরকম ঠাকুরের চক্ষের ভাব হল। মুখে হাস্য। কিন্তু শূন্য দৃষ্টি। হাসছেন—কিন্তু সেই দৃষ্টি কোনও কিছুতে নিবদ্ধ নয়।

ঠাকুর মাস্টারমশায়কে বলছেন, মহেন্দ্রনাথ, আমাকে একটি ছবি এনে দিতে পারো?

বললেন, বলুন ঠাকুর চেষ্টা করব।

পাখির বাসায় পাখি বসে আছে, ডিমে তা দিচ্ছে। দেখেছ তার চোখ দুটো?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। (এখন তো কাকের বাসা গাছে গাছে আছে। একটু সময় করে দেখলে দেখা যাবে যে মা কাক ডিমে তা দিচ্ছে এবং ঠোঁটটি হাঁ হয়ে আছে আর চোখ দুটো ফ্যালফ্যাল করছে।)

ঠাকুর বলছেন, যোগীর চোখ এইরকম হয়।

ঠাকুরের চোখ, সারা মুখ দিয়ে, সারা অঙ্গ দিয়ে জ্যোতি বেরোচ্ছে। হাসছেন খিলখিল করে। কিন্তু চোখ দৃষ্টিশূন্য। অর্থাৎ বিষয়ীর চোখ নয়, কোনও কিছুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়।

ঠাকুর পায়চারি করতে করতে বলছেন, বটতলায় পরমহংস দেখলাম। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে পরমহংস দেখলাম। এইরকম হেসে চলছিল, হা-হা করে হাসছিল। সেই স্বরূপ কি আমার হল? এইবার ঠাকুর পায়চারি করতে করতে ছোট খাটটিতে গিয়ে বসেছেন ও জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলছেন। মন্দিরে মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

ঠাকুর বলছেন, যাক, আমি জানতেও চাই না। মার সঙ্গে কথা বলছেন। যাক আমি জানতেও চাই না। মা, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি থাকে। ঠাকুর এ কথাটি কি জন্য বললেন? বললেন, উপনিষদ যেকথা বলছেন। অজস্র বই পড়া যেতে পারে। অজস্র তর্ক করা যেতে পারে। এবং জ্ঞানের পাহাড় হওয়া যেতে পারে।

কিন্তু তাতে যে আমার জ্ঞান বাড়বে, আমার চৈতন্য হবে—তা কিন্তু নয়। সেজন্য ঠাকুর বলছেন, মা এতক্ষণ ধরে ব্রহ্মের কথা বলেছি। এতক্ষণ ধরে নানারকম কথা বলেছি। বলেছি, ব্রহ্মের মধ্যে এই মায়াস্বরূপ জগৎ নিমজ্জিত হয়ে আছে। এবং জীব যেন সেই ব্রহ্মের বুড়বুড়ি।

এত সব কথা হয়ে গেল। হয়ে যাবার পর ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ—আমাদের জন্যই তিনি ভক্ত, এত উঁচু উঁচু কথা আমরা বুঝতে পারব না—বলছেন, যাক্ আমি জানতেও চাই না। মা, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি থাকে।

মাস্টারমশাই বলছেন, ক্ষোভ এবং কামনা-বাসনা গেলেই এই অবস্থা আসবে। ঠাকুর কিন্তু তাঁর কথা শুনলেন না। আবার মাকে বলছেন, মা পূজা উঠিয়েছ। আর পূজা করতে পারি না। সব বাসনা যেন যায় মা।

পরমহংস তো বালক। বালকের তো মা চাই। তাই তুমি মা, আমি ছেলে। মা-র ছেলে মা-কে ছেড়ে কেমন করে থাকে? আমি জ্ঞান নিয়ে থাকতে চাই না, ভক্তি নিয়ে থাকতে চাই। মা, আমি সমস্ত কামনা-বাসনা ছেড়ে দিতে রাজি আছি, কিন্তু তোমাকে ছাড়তে রাজি নই। কারণ, আমি এই নিঃসঙ্গ, ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে কাকে নিয়ে থাকব? যাকেই আমি আঁকড়ে ধরতে চাইব, কেউ কারোর নয়। স্বখাত সলিলে সবাই ডুবে আছে, সেইজন্যই মা আমি তোমাকেই চাই। তুমি থেকো

আমার মা হয়ে।

ঠাকুর এমনভাবে মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন, মাস্টারমশাই বলছেন, যে পাষাণ পর্যন্ত গলে যাবে। এইরকম ভাবে কথা বলছেন।

এবার মাকে বলছেন, শুধু অদ্বৈত জ্ঞান, হ্যাক থুঃ। জ্ঞানী বলে যে দুটো নেই—আমিই তুমি। তুমিই আমি, সোহম্—বলেই বলছেন, এই অদ্বৈত জ্ঞান আমি চাই না। ওতে আমি থুথু ফেলি। যতক্ষণ আমি রেখেছ, ততক্ষণ তুমি আছ—একথা বলেই বলছেন, পরমহংস তো বালক। বালকের তো মা চাই।

মণি অবাক হয়ে ঠাকুরের এই দেবদুর্লভ অবস্থা দেখছেন। ভাবছেন, ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তারই বিশ্বাসের জন্য, তারই চৈতন্যর জন্য আর জীবশিক্ষার জন্য আজ গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর এই পরমহংস অবস্থা।

মাস্টারমশাই আরও ভাবছেন, ঠাকুর বলেন, অদ্বৈত, চৈতন্য নিত্যানন্দ। অদ্বৈত জ্ঞান হলে চৈতন্য হয়, তবেই নিত্যানন্দ হয়। ঠাকুরের শুধু অদ্বৈত জ্ঞান হয়। নিত্যানন্দর অবস্থা। জগন্মাতার প্রেমানন্দে সর্বদাই বিভোর, মাতোয়ারা।

সংসারীদের বলছেন, তোমাদের জন্য অদ্বৈত জ্ঞান নয়, ব্রহ্ম নয়। যতক্ষণ আমি আছে, যতক্ষণ দেহবোধ আছে, যতক্ষণ বলছ—আমার খিদে পেয়েছে, আমি খাব। আমার অসুখ করেছে—ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ব্রহ্মস্বরূপে কখনই স্থিত হতে পারোনি। নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে এক ভাবার অধিকারী হওনি। অধিকারী না হয়ে কখনও অধিকারীর চর্চা কোরো না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, তোমাদের জন্য এই দুটো সত্তাই থাকাই ভালো। আমিও আছি, তুমিও আছ। বলেই ঠাকুর বলছেন, জগন্মাতার প্রেমে যেন সর্বদা বিভোর এবং মাতোয়ারা হয়ে থাকতে পারি। হাজরা মশাই হঠাৎ ঠাকুরের এই দশা দেখে মাঝে মাঝে হাতজোড় করে বলতে লাগলেন, ধন্য, ধন্য।

হাজরামশাই তো ব্রহ্মবাদী ছিলেন। নাস্তিক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে বলতেন, কি ওর সাথে বকর বকর করো? কি জানে ওই মূর্খটা? আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শেখাব—তিনি পর্যন্ত হাতজোড় করে বলছেন, ধন্য ধন্য, এ কি রূপ দেখছি তোমার? শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরাকে বলছেন, তোমার বিশ্বাস কই? তোমার তো বিশ্বাস নেই। তোমার তো শুধু জ্ঞান আর তর্ক। তবে তুমি এখানে আছ।

কেমন করে আছ? বলেই ঠাকুর বলছেন, জটিলে কুটিলে। জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। তুমি শ্রীরামকৃষ্ণকে খোঁচাবে আর শ্রীরামকৃষ্ণর আসল স্বরূপ বেরোবে।

মৌচাকে অনেক মধু আছে। কিন্তু কাঠি দিয়ে না খোঁচালে তো মধু বেরোয় না। শ্রীরামকৃষ্ণকে খোঁচাতে হবে।

এবার বিকেল হয়ে এল। মাস্টারমশাই একা নির্জনে দেবালয়ে বেড়াচ্ছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর এই অদ্ভুত অবস্থার কথা ভাবেন আর ভাবছেন ঠাকুর কেন বললেন, ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা হয়। এই গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ কে? স্বয়ং ভগবান কি আমাদের জন্য দেহধারণ করে এসেছেন? ঠাকুর বলেন, ঈশ্বর কোটি, অবতারাদি না হলে জড়সমাধি থেকে নেমে আসতে পারে না।

ইনি তো সমাধি হতে নেমে আসতে পারেন। মাস্টারমশাই একা পায়চারি করছেন আর ভাবছেন, সাক্ষাৎ এই মানুষটি যাকে দেখছি, ইনি কে? ইনি কি অবতার? না ইনি সেই ঈশ্বর যিনি নিজস্ব মানুষ রেখেছেন, তাদেরই একজনকে এখানে পাঠিয়েছেন। সংসারে থাকতে গেলে সবসময় এইরকম কিছু কিছু জিনিস চর্চা না করলে মন ছটফট করবে, ভীষণ ক্লান্তি আসবে, মনে হবে কি বকর বকর করছি—শুয়ে পড়লেই ভালো হয়। আবার শুয়ে মনে হবে শুয়ে পড়েই বা আমার লাভটা কি, আবার তো একটু পরেই উঠতে হবে। বাজার করার সময়ও ক্লান্তি, অফিস যাবার সময়ও ক্লান্তি, কোনও ভালো কথা শোনার সময়ও ক্লান্তি। সবসময় আমরা যদি ক্লান্তির উপাসনা করি, তাহলে আমরা ক্লান্ত হয়ে চিতায় চলে যাব। মরবার আগেই চিতায় চলে যাব।

সেইজন্য সবসময়ই এই ধরনের বলিষ্ঠ কথাবার্তা মনটাকে অন্য কিছু দিয়ে না ভরে এমন কিছু কথা দিয়ে ভার হোক, যে জিনিসগুলো সোনার চেয়েও মূল্যবান। নরেন্দ্রনাথের মতো তার্কিক, নরেন্দ্রনাথের মতো কলেজী যুবক বলেছিলেন, অন্বেষণ যদি করতেই হয়, ভালো কিছু জিনিসের অন্বেষণ করব—পচা কুকুরের মৃতদেহের অন্বেষণ করব না।

সেই কারণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আগামী দেড় হাজার বছরের চেতওয়ানী হয়ে এখানে রয়েছেন। তিনি সন্ন্যাসী হতে বলেননি। সংসারেই থাকতে বলেছেন। বলেছেন, স্ত্রী গ্রহণ করবে, একটি কি দুটি সন্তান হবে। প্রয়োজনে না হয় সদারা সহবাসী হলে, তাতেও দোষ নেই—কিন্তু মনটি ফেলে রেখো তাঁর দুয়ারে। এই হচ্ছে ঠাকুরের কথা। এর থেকে বড় কথা কোনও অবতার বলতে পারেননি। এইজন্যই তাঁকে বলা হচ্ছে—অবতারবরিষ্ঠায়। এইজন্যই বলা হচ্ছে—স্থাপকায় চ ধর্মস্য।

ধর্ম কি আগে ছিল না? ধর্ম যেরূপে ছিল, সেই রূপটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ঠাকুর এসে করলেন কি, বেদান্তটাকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, ভেবো না কিচ্ছু, তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মের বুড়বুড়ি। তুমি বড়ই হও, ছোটই হও; বড় বুদ্বুদই হও, ছোট বুদ্বুদই হও—তুমি কিন্তু তাইতেই আছ, মাছ যেমন জলে থাকে। এ তা ভুলে গেলেও তাতেই আছি, ভুলে না গেলেও তাতেই আছি। কিন্তু যদি স্মরণ করতে পারি যে ঈশ্বরেই আছি।

ঈশ্বরকে যদি মাঝে মাঝে বলতে পারি—কেয়াবাত, কি জিনিস তৈরি করে দিয়েছ এই পৃথিবীকে—তিনি খুশি হয়ে বলেন, বুঝতে পেরেছিস। আচ্ছা আরও বুঝিয়ে দেব তোকে পরে।

সেইজন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণর কোনও গুরুর প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলছেন, মা আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে দেন। আমরা যারা এখন রয়েছি, তারা সবাই ভবরোগে ভুগছি। সেই কারণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে বলা হচ্ছে, ভবরোগবৈদ্যম্।

আমি কে? তুমি কে?

আত্মানং বিদ্ধি। বিষয়টি একটু গূঢ়। এটা কেমন? যেন বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা। মানুষ প্রতিনিয়ত যা দেখে, সেটা হচ্ছে জন্ম আর মৃত্যু। মানুষ আসছে, মানুষ বড় হচ্ছে, মানুষ বিষয়ের মধ্যে প্রতিপালিত হচ্ছে। তার সুখ দুঃখের নিজস্ব সংজ্ঞা আছে। এবং আনন্দ সম্বন্ধে তাদের ধারণা হচ্ছে যে, আমাদের বোধ, বুদ্ধি এবং দেহ দিয়ে যে জিনিস স্পর্শ করতে পারি, উপভোগ করতে পারি—সেইটিই আনন্দের বিষয়। আর সেটি যদি আমাদের না আসে বা অন্যের থেকে আমাদের একটু কম থাকে! তাহলে আমরা দুঃখ পাই। তখন আমরা এই সমস্ত কথা বলতে থাকি—আমার কিছু হল না, আমি অপদার্থ, আমার দ্বারা কিছু হবে না। এবং এইরকম মানুষকে অন্যান্য পাঁচজন এই একই কথা বলতে থাকে। এগুলো হচ্ছে মনস্তত্ত্বের কথা।

মন আর আত্মা—দুটি কিন্তু ভিন্ন বস্তু। আমরা মনকে সাধারণত আত্মা বলি না। আত্মা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা সেটা হচ্ছে, এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার। বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা এটাই। কোনও মানুষ মারা গেলে, তিনি যদি আবার কোনও কারণে সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন দেন, তখন আমরা বলি, ভূত হয়ে ফিরে এসেছে। একথাও বলা হয় যে তাঁর আত্মা মুক্তি পায় নি, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করে এসো। আত্মাকে মুক্তি দিতে হবে। যদি মুক্তি না পায়, তাহলে সেই আত্মা অত্যন্ত কষ্টে থাকে এবং তার উত্তরপুরুষকে তারা অপরাধী করে। সেইজন্য শিগ্‌গিরি গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে এসো। তোমার বাবা উদ্ধার পাবেন। তোমার মা উদ্ধার পাবেন। এই ধরনের কথা আমরা শুনি। এগুলো সবই হচ্ছে স্থূল জগতের কথা।

মানুষ স্বভাবতই তার অবস্থানকে, তার জন্মকে একটা সহজ সংজ্ঞার মধ্যে আনতে চায় এবং সেইটি করতে গিয়েই তারা আবিষ্কার করে মানুষ—তার দেহ, তার চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া—এটা একটা ব্যাপার। আর মানুষের মন আরেকটা ব্যাপার। মানুষ মনে মনে চিন্তা করে, মনে ভাবে, মনে সংকল্প করে, মনে বলে যে, আইসক্রিম খাব কিংবা অমুককে গিয়ে কটুকথা শোনাব। অমুক অপমান করে গেছে, তাকে গিয়ে আজ দেখিয়ে দেব। বা অমুককে আমি খুব স্নেহ করব, ভালোবাসবো। সে আমার জন্য এত করেছে। আমি তাকে গিয়ে একটা উপহার দিয়ে আসব—এরকম সমস্ত মনের ক্রিয়া চলতে থাকে। এবং এই মনের ক্রিয়া দেহের মধ্যে বয়ে চলেছে। মন ভাবলে তবে দেহ কাজ করে।

একালের যাঁরা মনস্তত্ত্ববিদ, তাঁরা বলছেন—তোমার মনকে আগে দেখ। সেই মনে দুটো অংশ আছে। একটা হচ্ছে conscious part আর একটা হচ্ছে sub-conscious part। মন হচ্ছে glacier-এর মতো, হিমবাহের মতো, ভাসমান হিমশৈলের মতো। তার তিনের চারভাগ আছে অবচেতনে আর একের চার ভাগ ওপরে উঠে আছে। এই তিনের চারের মধ্যে সমস্ত কিছু লুকিয়ে আছে। তার সংস্কার, ভাবনাচিন্তা, frustration, তার আঘাত সব কিছু সেখানে চলে যাচ্ছে। এবং সেখান থেকে ঐ একের চার দৃশ্যমান মন বা সক্রিয় মনের দ্বারা সে পৃথিবীতে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। তার থেকে পৃথিবীটা কেমন সেই সম্পর্কে সে একটা ধারণা নিজের মধ্যে তৈরি করছে।

পৃথিবীটা কি আনন্দের? পৃথিবীটা কি দুঃখের? যেমন, একজন মানুষের সব কিছু আছে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসতেন। সেই স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। তখন তাঁর এই আহত মনের যে ক্রিয়াটি হল—প্রথমে তার মন যেটি জেগে আছে, সেটিতে সে একটি ধাক্কা খেল এবং সে ধাক্কাটি চলে গেল তার অবচেতনে। সেখানে গিয়ে এমন একটা কাণ্ড হতে পারে যে পরবর্তীকালে সে নারীবিদ্বেষী হয়ে যেতে পারে।

এইরকম একটি মন নিয়ে জুলে ভার্নের একটি গল্প আছে, ভারী সুন্দর গল্প সেটি— "Twenty thousand leagues under the sea"। এক সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন-এর গল্প। তিনি তাঁর স্ত্রীর দ্বারা এইভাবে ঠকে যাবার ফলে, এইভাবে বিতাড়িত হবার ফলে, এইভাবে পরিত্যক্ত হবার ফলে নারীবিদ্বেষী হয়ে উঠলেন। তিনি সমুদ্রের তলায় একটি সাবমেরিনের চালক হলেন। এবং তাঁর কাজই হল, যত জাহাজ তিনি দেখতে পেতেন, সেগুলিকে ডেপ্‌থ্ চার্জ করে ভরাডুবি করে দেওয়া। কিন্তু একাজ তিনি কেন করতেন? এইজন্য করতেন যে, সে জাহাজে নিশ্চয় কোনও নারী যাত্রী আছে। তার প্রতি বিদ্বেষে সেই জাহাজটি ধ্বংস করতেন। এইবার যখন তাকে ধরা গেল, তখন দেখা গেল যে সাবমেরিনে তার কেবিনের মধ্যে একটি অতি সুন্দর কারুকার্য করা সিন্দুকের মধ্যে তার স্ত্রীর ব্যবহৃত সমস্ত পোশাকাদি রয়েছে। সেইটিকে সে ওর মধ্যে সঞ্চিত রেখে তার বিদ্বেষ সে কার্যকরী করল এইভাবে। এই যে তার অবচেতন মনের ক্রিয়া, তাতেই সে নারীবিদ্বেষী হল।

কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলে sadist। তারা অপরকে দুঃখ দিয়ে সেই দুঃখ থেকে আনন্দ পেতে চায়। সে নিজেকে দুঃখ দেয় এবং অপরকেও দুঃখ দেয় নিজেকে যন্ত্রণা দেয় এবং অপরকেও যন্ত্রণা দেয়। সেইটার থেকে তারা আনন্দ পায়। এটা হচ্ছে sadism।

একালে মনস্তাত্ত্বিকেরা বলছেন যে একালের কোনও মানুষের মন শুদ্ধ নয়।

তার অবচেতনে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে যে বোধ, সেই বোধ তার সক্রিয় মনের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। তার ফলে, কোনও মানুষ প্রেমিক, কোনও মানুষ দয়ালু, কোনও মানুষ নিষ্ঠুর, কোনও মানুষ সমালোচক, কোনও মানুষ অন্যের দোষ দেখেই আনন্দ পায়—এইরকম হয়। এরকম বহুতর মানুষের বৈচিত্র্য আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। এটা হচ্ছে মন এবং দেহ।

এখনকার বিষয় কিন্তু এরও অনেক ঊর্ধ্বে। একটা মানুষ তার স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর এবং কারণ শরীর—এই তিনটি অংশ নিয়ে জগতে বিচরণ করছে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে 'ব্রহ্ম' বলে একটি শব্দ আমরা শুনেছি। কিন্তু সে বস্তুটি কি, তা আমরা জানি না। এবং ব্রহ্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে এইটিই বলা হচ্ছে।

জ্ঞানী বেদান্তবাদী যাঁকে ব্রহ্ম বলছেন, যোগী তাঁকে আত্মা বলছেন এবং ভক্ত তাঁকে ভগবান বলছেন। অতএব, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—তিনটিই এক। একই জিনিসের তিনটি সংজ্ঞা। এবার ব্রহ্ম সম্বন্ধে যেটি বলা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে একটি বিশাল বিশাল ব্যাপার। সে ব্যাপারের কোনও সংজ্ঞা নেই। মনস্তাত্ত্বিক জুং একটা ভারি সুন্দর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে, মানুষের পৃথিবীতে secret বা গোপনীয় বলে কিছু নেই। অনেকে বলে না ফিসফিস করে—তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। তিনি বলছেন, না, এটা আদৌ কোনও গোপন কথা হল না সংজ্ঞা অনুসারে। যদি এই পৃথিবীর একজন লোকও একটি জিনিস জেনে থাকে, তাহলে তার গোপনীয়তা নষ্ট হয়ে গেল।

তাহলে প্রকৃত, প্রকৃত গোপন জিনিস, প্রকৃত গুপ্ত জিনিস, প্রকৃত অজানা জিনিসটি কি? সেটি হচ্ছে ব্রহ্ম। বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে গিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে, সমস্ত জ্ঞানই উচ্ছিষ্ট হয়েছে, একমাত্র ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয়নি। কারণ, ব্রহ্ম কি? কেমন? তার সংজ্ঞা কি? কোনও মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আর যে মানুষ বলতে পারেন, যিনি ব্রহ্মে উপনীত হয়েছেন—তিনি কখনও আর ফিরে আসবেন না। ফিরে এসে বলবেন না যে, আমি এটা দেখে এসেছি।

এই বিষয়েরই একটা অনেক ছোট রূপ হচ্ছে—মৃত্যুর ওপারে কি আছে? কোনও মানুষ এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। কারণ, মৃত্যু না হলে কেউ জানতে পারে না এই লোক থেকে সে কোন্ লোকে যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে জানতে গেলে একটা বই পড়া যেতে পারে, অতি সুন্দর বই। নাম— 'Near Death Experience or After Death Experiance। পৃথিবীতে এরকম ঘটনা বেশ কিছু ঘটেছে যে ডাক্তার লিখে দিয়েছেন যে মারা গেছে অর্থাৎ medically declared dead, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেছে যে তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। এবং তিনি ফিরে এসে, কি কি দর্শন করলেন, ঐ অবস্থায় সেটি বলার চেষ্টা করেছেন।

এই বইটি পড়লে যা জানা যায় এবং মোটামুটি এঁদের যে সমস্ত অভিজ্ঞতা দেখা যায়, সেটা হল এইরকম—হঠাৎ যেন দরজা খুলে গেছে, হঠাৎ যেন ভীষণ উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে কোনও বস্তুর আকার আকৃতি কিছুই বলা যাচ্ছে না। যেমন আমরা বলি, টেবিল, চেয়ার, বাড়ি, ছবি ইত্যাদি, সেরকম কিছু সেখানকার সম্বন্ধে বলা যাচ্ছে না। একটা ভয়ঙ্কর আলো—সেই আলোর অনুভূতিটা তাঁদের হয়েছে। আর একটা ভারহীনতা, আর একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ—এইটা তাঁরা বোধ করেছেন।

অর্থাৎ আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেহখাঁচায় আবদ্ধ হয়ে আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সেই বোধটি উপস্থিত আছে—এবং সেটিকে আমাদের বেদান্তবাদীরা কি বলছেন?

যেন, অয়স্কান্ত মণি। একটা অদ্ভুত ধরনের উজ্জ্বল পদার্থ আমাদের ভেতরে রয়েছে। কিন্তু সেটি আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেটি চাপা পড়ে আছে। অনেকটা মাটির তলায় একটা হীরে পড়ে থাকার মতো। সেটা আমার মধ্যেই আছে। যাঁরা জানেন, তাঁরা বারেবারে বলেছেন, সেইটির অনুসন্ধান করো।

পৃথিবীতে সোনা অনুসন্ধান করার জন্য আমরা টেক্সাসে গেছি, অ্যারিজোনায় গেছি। আমরা হীরে খোঁজার জন্য খনিতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পাথর কেটেছি, মাটি কুপিয়েছি এবং হয়তো হঠাৎ একটা হীরে পেয়েছি। কিন্তু আমাদের ভেতরে মণির মণি, চেতনার চৈতন্য, অস্তিত্বের অস্তিত্ব যে বস্তুটি লুকিয়ে আছে, সেটিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা আদৌ আমরা করি না।

কারণ, পদ্ধতিটি অতি সহজ, কিন্তু অতি কঠিন। কারণ আমি ইন্দ্রিয় সহায়। যে ইন্দ্রিয় রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, জগতের ধারণা নিয়ে আসে, তাই দিয়ে, ঐ তুচ্ছ আমি দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, ঐ তুচ্ছ বোধ দিয়ে সে বস্তুটিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ, সেই জায়গায় পৌঁছতে হলে আমাদের sub-conscious এবং conscious-এ আমাদের মনে যে জগৎ-চিত্র আছে, ইন্দ্রিয়রা প্রতি মুহূর্তে ঐকতানে আমাদের জগৎ অস্তিত্ব সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি করছে, সেগুলোকে সবরকমে স্তব্ধ করে দিতে হবে। এবং আমার আমিটা যতক্ষণ পর্যন্ত 'perfect' আমি না হচ্ছে।

এই perfect-টা কি রকম?

যাঁরা physics-এর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁরা জানেন যে যখন আমরা কোনও জিনিসকে মাপতে চাই, কোনও জিনিসকে ওজন করতে চাই, তখন যে বস্তুটি দিয়ে মাপ বা ওজন করছি সেটিকে আগে পরীক্ষা করে নিতে হয় যে এটি ঠিক আছে কিনা। আবার দেখা যায়, আমরা যে-সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করি, সেটা একেবারে সঠিক হতে পারে না। সেইজন্য একটা কথা আছে যে percentage of

errors কতটা [illegible] দিক থেকে [illegible] হয়েছে?

সেইরকম, আমি, যে আমি ঐ বড় আমিটিকে, যে আমি থেকে সমস্ত আমির উদ্ভব হচ্ছে, ধরবে—তাকে পরিশ্রুত হতে হবে। অর্থাৎ তাকে, সেই বড় আমিটিকে ধরতে গেলে এই আমিটিকে পরিশ্রুত হতে হবে। তার মধ্যে যেন কোনরকম bias না থাকে। আর এই আমিটা যেন সেই আমি, সেটি দেহগত আমি না হয়। সেই দেহগত আমিটিকে বলা হয় অহংকার।

আমি আর অহংকার এ দুটো বস্তু আলাদা। ক্ষুদ্র আমিকে বলে অহংকারে আচ্ছন্ন আমি। যে আমি তার নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দেহগত যোগ্যতা, তার পারিবারিক শিক্ষা, তার সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি অনুযায়ী তৈরি হয়েছে, তাকে বলে conditioned আমি। সে ইতিমধ্যেই জর্জরিত হয়ে আছে, সে ইতিমধ্যেই একপেশে হয়ে আছে। সে perfect নয়। অতএব, এই আমি দিয়ে ঐ ব্রহ্ম নামক বস্তুটিকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। তার কারণ, তার মধ্যে অবিশ্বাস আছে। সে জানে না কার অনুসন্ধান সে করতে যাচ্ছে। এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত অনুসন্ধানের পিছনে একটা আত্মিক বিশ্বাস যুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সেই জায়গায় পৌঁছতে পারবে না।

এইবার যদি আমরা মনের কাছে ফিরে আসি, তাহলে দেখা যাবে যে আমরা সেই জিনিসই ঠিকমতো করতে পারি যে জিনিসে মনের সায় আছে। তাহলে কি মানুষ মন ছাড়া কাজ করছে?

খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, হ্যাঁ করছে।

কি করে করছে?

অভ্যাস।

মন বাঁচতে বাঁচতে কতকগুলো ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়। তখন সে যা করে, সেটা অনেকটা blind-folded। যেমন, চোখ বাঁধা অবস্থায় যাদুকর মোটর সাইকেল চালাচ্ছে, সেইরকম। সে জানে না সে কি করছে। সকালবেলা উঠে শরীর যত খারাপই থাক, যার casual leave পাওনা নেই, সে অফিস যাবেই। সকালে উঠেই যেমনই শরীর থাক, সে বাজারে যাবেই। আগের দিন রাত্রিবেলা সে যদি কোনও শ্মশান থেকেও ফিরে আসে, সে খবরের কাগজের হেডলাইনটা একবার দেখবেই। এই যে কতকগুলো কাজ—সে দাঁত মাজবেই, সে স্নান করে একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াবেই—এই বস্তুগুলো অভ্যাসের জগতের বস্তু। এগুলো সব মানুষই করে থাকে এক একরকম ভাবে। সুতরাং, মন যেখানে অভ্যাসে হারিয়ে যায়, সেখানে মনের যোগ থাকে না। মন তখন রোবটের মতো হয়ে যায়। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন সৈনিকদের বলা হয় 'ফায়ার', তখন কিন্তু সে বিচার করে না

কাকে ফায়ার করছি? কাকে মারছি?

মানুষ মানুষকে মারছে। কেন মারছে? এ সমস্ত বোধ তার মধ্যে তখন আসে না। এই সমস্ত আধ্যাত্মিক চিন্তা তার মধ্যে আসে না। এই ধরনের উচ্চচিন্তা তার মধ্যে আসে না। সেই কারণে পৃথিবীর সমস্ত সৈন্যবাহিনীতে মানুষকে প্রথমেই যেটা করা হয়, সেটা হচ্ছে তাকে মৃত মানুষে, রোবটে পরিণত করা হয়। এবং যে সমস্ত মানুষ এই পৃথিবীর বিভিন্ন establishment-এ হাজারে হাজারে চাকরি করছেন, তাঁরাও কিন্তু একধরনের 'দাস আমি'-তে পরিণত হয়েছেন।

আমি বলব—তুমি করবে। কোনও প্রশ্ন করবে না। কিছু টাকা পাবে।

আমি বলব, তুমি গুলি চালাবে। কিছু মানুষ মরবে। একটি মাত্র কথা বলা হবে, 'দেশাত্মবোধ'। দেশের জন্য যুদ্ধ কর। প্রশ্ন কোরো না।

যে কাজে একজন ব্যক্তিমানুষ কোনও প্রশ্ন করে না, যে কাজে একজন মানুষ তার নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে সঠিক কি বেঠিক এই সন্ধান পায় না—সেগুলো তার অভ্যাসের দুনিয়ার কাজ।

একটা ঘোড়া দৌড়চ্ছে, একটা মানুষ ছুটছে, একটা মানুষ লাফ মেরে বাসে উঠছে, একটা মানুষ অফিসের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ছে, ফাইল টেনে নিয়ে লিখছে—এগুলো তার অভ্যাসের জগতের ব্যাপার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই মনটা একটা বিশাল ব্যাপার। এই মনটাই কিন্তু ঘুরেফিরে আমাদের জীবন চালাচ্ছে। এই মনই বাড়ি ফিরে আসছে দেহের ব্যাগের মধ্য দিয়ে এবং ফিরে এসে সে টেলিভিশন দেখছে। ছেলেমেয়েকে পড়াতে হয় পড়াচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হয় বলছে, খেতে হয় খাচ্ছে। সেই কারণে আজকের medical world-এ দেখা যাচ্ছে যে Neuro disease-এর সংখ্যা বাড়ছে। কোনও মানুষ সুস্থ নয়। দেখা যাচ্ছে, সমস্ত মানুষই indigestion, tension-এর শিকার। কেন এরকম হচ্ছে?

কারণ, তাদের মন। যে মন তার সারা শরীরে সুস্থ অবস্থায় বিচরণ করে তাকে আনন্দে রাখবে, তাকে আনন্দে খাওয়াবে, তাকে আনন্দে হজম করাবে, তাকে আনন্দে সুখনিদ্রায় নিয়ে আসবে, আনন্দে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করাবে—সে মন কোথায়?

This world is a civilized world এবং সেই সভ্যতা এখন এমন একটা জায়গায় গিয়ে উঠেছে যেখানে মনে হচ্ছে মানুষের আর কোনও প্রয়োজন নেই। এটাও একটা মানুষের Inferiority complex। যন্ত্র, technology মানুষকে ছাপিয়ে চলে যাচ্ছে। অফিসে অফিসে গিয়ে শুনতে হয়, আপনার আর কাজ নেই, এখন কম্পিউটার সব করে দেবে।

কি এতক্ষণ ধরে যোগ, বিয়োগ, গুণ করছেন? আপনার কাছে ক্যালকুলেটর

নেই?

এরকম সমস্ত কথা শুনতে শুনতে এই ধরনের ধারণা হচ্ছে যে এই পৃথিবীতে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে।

সুতরাং, এই মন দিয়ে আমরা সেই ব্রহ্মকে কি করে খুঁজে পাব? তাঁকে পেতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? উপনিষদ বলছেন—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য
ন মেধয়া ন বহুনাশ্রুতেন।

যতই পড়, যতই শোন, যতই সেরিব্রাল এক্সারসাইজ কর, তাঁকে পাবে না।

তার কারণ, তাঁকে পেতে গেলে তোমাকে বীর্যবান হতে হবে। তোমাকে সংকল্পে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এবং তোমাকে এই সংকল্প করতে হবে যে আমি পৌঁছব।

কোথায় যাব?

এক ফার্লং? দু ফার্লং? এক কিলোমিটার? দশ কিলোমিটার?

না।

It is very near। তোমার পাশে বসে আছেন তিনি।

উপনিষদ বলছেন যে, একটি বৃক্ষ—

আমরা এ পৃথিবীতে যা গাছ দেখি, তার শিকড় তলায় আর শাখা-প্রশাখা ওপরে। কিন্তু এই বিশ্ব নামক যে বৃক্ষের ডালে ডালে আমরা বিচরণ করছি, সেটি হচ্ছে ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ। অর্থাৎ তার মূলটি ওপরদিকে।

কেন?

কারণ, ঐ দিক থেকেই পৃথিবী আসছে। সমস্ত কিছু সংগৃহীত হচ্ছে ওপর থেকে— not from down, not from earth।

আর সেই গাছেরই একটি ডালে বন্ধুর মতো দুটি পাখি পাশাপাশি বসে আছে—দ্বা সুপর্ণা সাযুজ্য শাখায়া'।

এ দুটি পাখি কে?

একটি হল জীবাত্মা, আর একটি হল পরমাত্মা। দুটি পাখি। তাদের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব। তারা পাশাপাশি দুটি ডালে বসে আছে। জীবাত্মা নামক যে পাখিটি, যে সংসারে গেছে। সে তিক্ত, কটু, কষায় ফল আস্বাদন করছে। সে সুখদুঃখে তাড়িত পীড়িত হচ্ছে। তার জন্ম মৃত্যু বোধ আছে। তার সময়ের বোধ আছে। আর একটি পাখি সেই একই ডালে, পাশে বসে আছে। সেটি হচ্ছে পরমাত্মা। সেটি এটিকে দেখছে আর অপেক্ষা করে আছে কখন সে তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে এই পৃথিবীটাকে এই বলে বুঝতে পারবে যে এখানে নিত্য, শাশ্বত বলে কিছু নেই। আজ যা আছে, কাল তা থাকবে না। আজ যা নেই, কাল তা হবে।

এবং আজ যা হয়েছে কাল তা থাকবে না।

আমি যা অর্জন করেছি, আমি যা সংগ্রহ করেছি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, যে অর্থবিত্ত আমি রচনা করেছি—মৃত্যুকালে সেগুলোর কোনটাই আমার সঙ্গে যাবে না। আমি বিবাহ করেছিলাম বহু আশা করে। যাকে নিয়ে এসেছিলাম গাঁটছড়া বেঁধে, সুখে দুঃখে যার সঙ্গে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছি—যাবার সময় সে কিন্তু আমার সঙ্গে যাবে না। বা আমি চলে গেলেও, সে আমার সঙ্গে যাবে না।

একলা যাত্রী এই পৃথিবীতে এসেছি। কি আলো নিয়ে এসেছি, আমি জানি না। ছিলাম একটি ছোট গুহার মতো জায়গায়। মাতৃজঠরে, গর্ভসলিলে, ঊর্ধ্বপদ নিম্নমুখ হয়ে। এবং তারপরে যখন পৃথিবীর এই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছি, তখন দেখা যাচ্ছে সে কি অদ্ভুত ব্যাপার।

একটা intact system ভেতরে আছে। শুধুমাত্র brain waves নিতে শিখেছে। বাকি লাংস, হার্ট, কিডনি—এ যেন একেবারে well packed একটা যন্ত্র। যতক্ষণ না পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো উন্মোচিত হবে না। সেগুলো টিক্‌টিক্ করতে আরম্ভ করবে না। হৃদয় লাব্‌ডুব্ লাব্‌ডুব্ শব্দ করবে না। পাকস্থলী হজমের কাজ শুরু করবে না। আমার ফুসফুস বায়ু নেবে না। আমার অন্ত্র, যে পয়ঃপ্রণালী আছে সেগুলোও কার্যকরী হবে না।

এ এক অবাক করা ব্যাপার! দশটি মাস যে ছিল যাগেযোগে, সে নেমে পড়েছে পৃথিবীতে।

কোন্ পৃথিবীতে?

যে পৃথিবী থেকে তাকে চলে যেতে হবে। আস্তে আস্তে সে বড় হবে। সে যদি নিজে পথ হেঁটে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, ভারতবর্ষ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড না-ও ঘোরে, তার জীবনের দিন ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকবে।

এ কেমন ব্যাপার?

যেন আমি ছাড়াই, আমার দেহ ছাড়াই একজন পথিক আমার থেকে বেরিয়ে বহুদূর বহুদূর চলে যাচ্ছে। আজ থেকে ত্রিশ বছর দূরে দাঁড়িয়ে বলছে, আমি এখানে এই অবধি চলে এসেছি। আরও ত্রিশ বছর গিয়ে সেখান থেকে বলছে, আমি এই অবধি চলে এসেছি। আরও ত্রিশ বছর গিয়ে বলছে, আমি সমুদ্র পেয়ে গেছি। আর যেই মুহূর্তে বলেছে সে যে, "আমি পেয়ে গেছি তাকে। সেই মুহূর্তে এখানে আমার দেহ, আমার খাঁচা, আমার যন্ত্র সমস্ত কিছু কোলাপ্‌স করে পড়ে গেছে।

এই পথিকটি কে?

এ হচ্ছে আমার সেই পরমাত্মা। সে আমার ভেতরেই বসে আছে। শুধু আমার ভেতরে নয়, পৃথিবীতে যত আমি আছে, তাদের সবার মধ্যে আর একটা আমি বসে আছে। তাকে ভক্ত বলছে 'তুমি'। আর ব্রহ্মবিদরা বলছেন, 'আত্মা'। আত্মার কি দরকার ছিল আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এসে আমার সঙ্গে দুঃখ ভোগ করার?

না, তিনি দুঃখ ভোগ করছেন না। তিনি বারে বারে আমাকে শেখাতে চাইছেন।

কি শেখাতে চাইছেন?

সেটা হচ্ছে এই যে, এই পৃথিবীর জ্ঞান তুমি অর্জন কর। তুমি কে যদি জানতে পারো, তাহলে এই পৃথিবীর মায়ার জগৎ তোমাকে আর গ্রাস করতে পারবে না। সেইজন্য আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাটা এই রকম নয়—নদীতে গেলাম আর ঘট ভরে জল নিয়ে চলে এলাম।

এটা অনুভূতির ব্যাপার। এটা উপলব্ধির ব্যাপার। এটা দর্শনের ব্যাপার। এটা অন্যকে দেখার ব্যাপার। এটা বিচারের ব্যাপার। সেইজন্য বলা হচ্ছে, বেদান্তী হচ্ছেন একজন প্রকৃত বিচারকর্তা। সে বসে বসে নেতি নেতি করে সেই বস্তুতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, যেটি ইতি, যেটি নিত্য, যেটি শাশ্বত।

এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, সকলের পক্ষে তো এটি করা সম্ভব নয়। একমাত্র তিনিই পারবেন যার মধ্যে সংকল্পের উদয় হয়েছে। সে ঘা খেতে খেতে frustrated হয়নি, সে ঘা খেতে খেতে সিজোফ্রেনিক হয়নি, সে ঘা খেতে খেতে ভেঙে পড়ে একপাশে বসে 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল' বলছে না, দুঃখের গান গাইছে না। সে বলছে না, মেরেছ বেশ করেছ, তুমি তো মারবে জানি; কিন্তু তোমার কোনও মারই আমাকে আহত করতে পারবে না, কারণ আমি তার সন্তান।

এটাই হচ্ছে আত্মবোধ। এই আত্মবোধে জাগরিত হয়ে যে যাত্রী যাত্রা শুরু করেছে, সে-ই পরমপদ পাবে।

কখন পাবে? সবশেষে পাবে?

না। তখন তার এই আত্মজ্ঞান তাকে বন্ধুর মতো সঙ্গে করে এই পৃথিবীর পথ ধরে ধরে ধরে ধরে নিয়ে যাবে, আর বলবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ, 'এ কেয়া তামাশা'। সেইজন্য রামপ্রসাদ বলেছেন, 'এ জগৎ ধোঁকার টাটি। আমি খাই-দাই আর মজা লুটি।'

এ কারণেই আত্মজ্ঞান-কে কোনও সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা যায় না। self বলে ইংরাজিতে একটা কথা আছে।

What is self ?

সেটা হচ্ছে আমি, আমি যেটা বলছি, তারই একটা variation। যখনই 'আমি', 'আমি' বলছি, তখনই আমার ভেতর থেকে আমার অহংকার, আমার নিজস্ব বোধ, যেটাকে বলা হয় আমার নামরূপ, আমার উপাধি, আমার শিক্ষা, আমার জ্ঞান, আমার পারিবারিক পরিচয় এই আমিকে conduct করছে। এই যে আমি, যে আমি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত, সেই আমিটাকে ভুলতে হবে। আমি থেকে আমি-কে মুক্ত করতে হবে, তখনই পাওয়া যাবে সেই 'আমি'কে ঠাকুর যাকে বলছেন পাকা আমি।

এইবার ব্রহ্মতত্ত্ব। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যত সহজে বুঝিয়েছেন আমাদের সাংখ্য, আমাদের বেদান্ত, আমাদের পঞ্চদর্শী, আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রসমূহ—কেউ এইভাবে বোঝাতে পারেনি। কারণ, ন্যায়ের পথে শ্রুতি, স্মৃতি ও বিচারের পথ হচ্ছে জ্ঞানীর পথ। সে পথে শঙ্করাচার্য হাজির হয়ে বলেছেন, এই জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। তিনি ঘোষণা করে দিলেন, তোমরা যে পৃথিবীতে বসে আছ, এখানে খাচ্ছ-দাচ্ছ, রোজ সকালে গাড়ি করে যাচ্ছ, একটা কোথাও দুর্ঘটনা হল, একটা বাস পুড়ে গেল, এখানে ক্রিকেট খেলা হয়েছে।—এই যে বোধের জগৎ, এই বোধের জগতের অনুভূতি দিয়ে তুমি কিন্তু কিছু পাবে না। সরে এসো। এগুলো অনিত্য। নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করো।

নিত্যবস্তু কি?

তুমি চলে যাবার পর, সমস্ত মানুষের আসা যাওয়ার পথের ধারে সেই একটি লাইটহাউস, একটি সত্য যা জাগ্রত হয়ে আছে, সেটি হচ্ছে মৃত্যু কোনদিন এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে পারবে না। তার কারণ হচ্ছে, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বেদান্তের ধারণা।

বেদান্তের ধারণা হচ্ছে যে ব্রহ্ম হচ্ছে একটা সিন্ধুর মতো। আপনারা অনুমান করুন—একটা বিশাল বিশাল সমুদ্র। নিশ্চল, নীরব ঢেউহীন পড়ে আছে। তার পরিমণ্ডলে কোনও বাতাস নেই। সেখানে কোনও আলো, আমাদের চোখ যে আলো দেখে সেই আলোর মতো কোনও আলো নেই। কারণ, এই পৃথিবীটা অন্ধকারের, না এই পৃথিবীটা আলোর—তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। আমরা তো চোখ দিয়ে দেখি সূর্য উঠছে, সূর্য নামছে। যতক্ষণ সূর্য থাকে, ততক্ষণ আলো। যখন সূর্য নেই, তখন অন্ধকার। তখন অন্ধকার আকাশে তারা, নক্ষত্র, কখনও কখনও চাঁদ দেখতে পাই।

এ তো আমাদের ইন্দ্রিয়ের চোখ দিয়ে দেখা, আর এই জগৎটাই হল মায়ার জগৎ। এই মায়ার জগৎ কি করে তৈরি হল?

ওই নিশ্চেষ্ট। ওই নিরাকার অথচ সাকার ওই যে সিন্ধুস্বরূপ ব্রহ্ম পড়ে আছেন অচল, অবিচল। সেখানে মায়া, মায়া তরঙ্গ তুলল এবং তার ফলে কি

হল?

সেখানকার বস্তুকণা উৎক্ষিপ্ত হল। অণুতে অণুতে মিলিত হয়ে তৈরি হল পরমাণু। পরমাণু পরমাণুতে মিলিত হয়ে তৈরি হল বিভিন্ন বস্তুকণা। যাঁরা কেমিস্ট্রির ছাত্র তাঁরা জানেন যে, সমস্ত পদার্থ, আমরা যাকে সোনা বলছি, রুপো বলছি, তামা বলছি—এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে রয়েছে ঐ অ্যাটম বা অণু। আবার ওই অ্যাটমের মধ্যে রয়েছে একটি করে নিউক্লিয়ার এবং তার মধ্যে negative আর positive particles ঘুরছে—আর সেইখান থেকে তৈরি হয়ে যেন এক একটি বস্তুর দু-তিনটি করে হাত বেরোচ্ছে।

উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও ভালো বোঝা যাবে। যেমন, অক্সিজেন নামক বস্তুটির দুটি হাত আছে। তিনি দু-হাতে এক হাত বিশিষ্ট হাইড্রোজেনকে ধরতে চাইছেন এবং এই অক্সিজেন দু হাত বাড়িয়ে দুটি হাইড্রোজেনকে যেই ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে যে ম্যারেজ বা পরিণয় হল তাতে তৈরি হল একবিন্দু জল।

এইবার বিজ্ঞানীরা এসে বললেন যে হাইড্রোজেন নামক বস্তুটি অনবরত ঐ এক হাত দিয়ে আর একটিকে ধরতে চাইছে। আর দু হাত বিশিষ্ট অক্সিজেনও চাইছে হাতদুটো যেন খালি না থাকে। সে-ও আর একটিকে ধরতে চাইছে।

আচ্ছা, অক্সিজেন যদি হাইড্রোজেনকে ধরতে চায় এবং হাইড্রোজেনকে যদি সরিয়ে রেখে দেওয়া যায়, তাহলে অক্সিজেন কি করবে?

অক্সিজেন সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অক্সিজেনকে ধরে O_2 হয়ে যাবে। আর হাইড্রোজেনকে যদি চেপে ধরে রাখা যায়, তাহলে হাইড্রোজেনের কি হবে?

H_3 তিনটি হাইড্রোজেন হয়ে heavy water ডয়টোরিয়াম তৈরি হবে যা পরমাণু বোমার একটি মস্ত বড় উপাদান। একটা বিখ্যাত বই আছে— A first few minutes of creation। এখানে বলা হয়েছে যে একটা সময়ে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। হঠাৎ একটি স্ফুরণ, হঠাৎ একটি বিস্ফোরণ—তারপরে দেখা গেল যে জগতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অনন্তে একটি অগ্নিগোলক, ভীষণ উত্তাপ। সমগ্র স্থানটি তখন ভীষণ জ্যোতির্ময়। কোটি সূর্যের ভাতি। পরে আস্তে আস্তে যখন ঠাণ্ডা আরও ঠাণ্ডা হতে থাকল, তখন particles, atoms এ সমস্ত তৈরি হল। তবে তারা তখনও পর্যন্ত positive, negative এই তড়িৎকণা পায়নি। সবই তখন positive।

অদ্ভুত ব্যাপার! সবই positive মানে কি?

পুরুষ। তখনও পর্যন্ত প্রকৃতি আসেনি। পুরুষ আর প্রকৃতি না হলে সৃষ্টি তো হবে না। একজন পিতা কি ইচ্ছা করলে শত সন্তানের জনক হতে পারে?

না। একজন জননী চাই। শক্তি চাই।

সঙ্গে সঙ্গে হল কি?

Negative particles তৈরি হল।

তার কারণ কি?

ঐ যে ব্রহ্মার বুকের উপর মায়ার তরঙ্গ খেলছিল। তখন তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ইচ্ছামাত্রই তাঁর কাজ হচ্ছে।

তিনি বললেন, হোক।

বাইবেল যেটা বলেছেন, Let there be light and there was light। Let there be all sorts of species and there were the species। সৃষ্টির সেই তিনি, ভগবান নিজের হাতে পৃথিবীর ধূলিকণা দিয়ে তাঁর অবয়ব বিশিষ্ট মানুষ তৈরি করলেন। তাকিয়ে দেখছেন—বাঃ, চমৎকার তৈরি হয়েছে! কিন্তু তখনও তাতে প্রাণ আসেনি।

তখনকার চিত্রটি কল্পনা করুন। সৃষ্টির সেই প্রথম উষাকালে ভগবান স্বয়ং হাঁটু গেড়ে বসেছেন এবং তাঁর নিজেরই রচনা ঐ মনুষ্যমূর্তির ঠোঁট দুটি ফাঁক করে He breathed in three breathes of life। তিনবার বাতাস ঢুকিয়ে দিলেন। প্রাণ, অপান, সমান, উদান বায়ুর কথা আছে আমাদের শাস্ত্রে। এই বায়ুরই কোনটি আমাদের হৃদয়কে চালাচ্ছে, কোনটি আমাদের ফুসফুসকে সক্রিয় রেখেছে। কোনটি আমাদের এই উদরের পরিপাক শক্তি চালাচ্ছে এবং কোনটি আমাদের শরীরের অভ্যন্তরস্থ বর্জ্য পদার্থকে পয়ঃপ্রণালীর দিকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আর একটি বায়ু ক্রমশ ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে গিয়ে আমাদের মস্তিষ্ককে সক্রিয় করছে।

এরপর আসবে যোগের কথা। আমাদের বৈদান্তিকরা যে বলছেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ব্রহ্ম means আত্মা। আত্মা যখন সক্রিয় হয়ে উঠে শক্তির সাহায্য নিচ্ছেন, তখনই এই অদ্ভুত বিশ্ব বিরাট বৈচিত্র্য নিয়ে ফেটে পড়ছে।

আর তখনই জন্মাচ্ছে, আমি আমি আমি—অনেক আমি এবং সমস্ত আমি হচ্ছে সেই আমি থেকে উদগত। কিন্তু অহংকার, নিজের অহংকার—আমার অবস্থিতির অহংকার, আমার জন্মের অহংকার, আমার পিতৃমাতৃ পরিচয়ের অহংকার। এই বিশ্বের ভ্রমণের চোখ দিয়ে দেখা এই পৃথিবীর অনুভূতির অহংকার, আমার আবিষ্কারের অহংকার, আমার বক্তব্যের অহংকার, আমার বেঁচে থাকার অহংকার, আমার চেষ্টার অহংকার, আমার অর্জনের অহংকার—সমস্ত কিছু নিয়ে সে আমিটি তৈরি হয়েছে। এমনই মজা যে সে এই মায়াচ্ছন্ন হয়ে ক্রমশ ক্রমশ আত্মবিস্মৃত হয়ে সে কে, এইটি ভুলে গিয়ে নেশার ঘোরে যেন অন্ধকারে মাতালের মতো টলে টলে ফেরে এবং নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত, তুচ্ছ স্বার্থের দ্বন্দ্বে নিজের জীবন ক্ষয় করে আবার ফিরে চলে যায়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এর একটি ব্যাখ্যা করেছেন।

কেন এমন হয়? মানুষ যদি অমৃতের পুত্র হয়, সবাই যদি ভগবান হয়—তাহলে এমন কেন হচ্ছে?

ঠাকুর যে কথাটি বলেছিলেন, সেটা কবির কথা—'নিজেকে হারায়ে খুঁজি'। একটা কিছু তো খুঁজতে হবে। একটা কিছু তো অজানা থেকে যাবে। সব পাওয়ার শেষে যে বস্তুটি পেয়ে মানুষ ধন্য ধন্য করে উঠবে, এই পৃথিবীর দিকে পরিত্যক্ত চপ্পলের মতো তাকিয়ে বলবে, পড়ে থাক ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জীবন, ছেঁড়া সংসার—আমি পেয়ে গেছি তাঁকে।

ঐ যে 'তাঁকে', এইটিই হচ্ছে আত্মা। এইটিই হচ্ছে আত্মজ্ঞান। এইটিকেই বলা হচ্ছে চৈতন্যের আলো। সেইজন্য বোধ ও বুদ্ধি—তারও উর্ধ্বে বসে আছে চৈতন্য।

এইটিই হচ্ছে চিদাকাশ। আমাদের ভেতরে তিনটি আকাশ আছে। একটি মহাকাশ। আমরা যদি ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে অনন্ত অনন্ত সূর্য, চন্দ্র, গ্রহতারা। এটি হচ্ছে মহাকাশ। আরেকটি কি আকাশ?

সেটা হচ্ছে আমার ভেতরে, দেহের ভেতরে যে আকাশটি আছে। সেটিও একটি আকাশ। সেই আকাশে আমার বোধ, বুদ্ধি সমস্ত ভাসছে। আর তার মধ্যেই আমার চিদাকাশ বসে আছে আচ্ছন্ন করে। প্রতি মুহূর্তে এটি আমাকে ভাবাচ্ছে। প্রতিটি কাজের পরই আমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করছে। আমি এটা কি করছি?

পৃথিবীতে এমন কোনও মানুষ নেই যে ছুটতে ছুটতে একবার থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে না যে তুমি কি করছ?

আমি সারাটা দিন কি যে করে বেড়াচ্ছি ভাই, আমি নিজেই জানি না।

এইখানেই তিনি বসে আছেন। এ প্রশ্ন তাঁরই প্রশ্ন। একটা লোকে হঠাৎ হাঁচতে শুরু করল। তাকে প্রশ্ন করা হল, হঠাৎ কি হল তোমার?

সে বললে, নাকে কি যেন একটু সুড়সুড় করে উঠল ভাই।

আমাদের দেহের ভেতরে মনেরও এইরকম সব ফাইবার আছে। সে প্রতি মুহূর্তে একটু একটু নড়ে নড়ে আমাদের বলতে চাইছে, মন তুমি একবার ভেবে দেখ কিসের পেছনে ছুটছ? কিসের পেছনে দৌড়চ্ছ?

এইটিই হচ্ছে মানুষ নামক প্রাণীর একটি প্রকাশ, একটি আচরণ। কুকুর এরকম করে না। বেড়াল এরকম করে না। ইঁদুর এরকম করে না। একমাত্র মানুষই এরকম করে।

তার কারণ হচ্ছে, মানুষ হচ্ছে জীবাত্মা আর পরমাত্মায় জড়াজড়ি করে একটা অবস্থান। এবং সেখানে মস্ত বড় একটা বস্তু তাকে কাবু করে রেখেছে লেপের মতো, কম্বলের মতো, আচ্ছন্ন সূর্যের মতো—সেটি হচ্ছে আত্মবিস্মৃতি, সে

ভুলে গেছে, সে কে? সে জানে না, সে কে?

এই জানাটা, এটাকেই বলে স্বপ্রকাশ। তুমি নিজেকে নিজে প্রকাশ করো। অন্য কারোর, পৃথিবীর কারোর, কোনও মানুষের সে ক্ষমতা নেই। কোনও সার্জেনেরও সে ক্ষমতা নেই। তিনি পেট চিরে গলব্লাডার বের করে দিতে পারেন, কিন্তু তোমার মোহের আবরণ কেটে তোমার ভেতরে যে চৈতন্যের অয়স্কান্ত মণিটি আছে, সেটিকে গলস্টোনের মতো তোমার হাতে ধরিয়ে দিতে পারবেন না।

এইটির জন্যই দরকার আমাদের ভারতের বেদান্ত ঋষি, বৈদান্তিকদের মতো সাধনা। চরৈবেতি, চরৈবেতি—আরও এগোও, আরও এগোও। জীবনের পথ ধরে, সংসারের পথ ধরে, অভিজ্ঞতার পথ ধরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এগোও। এবং যত তুমি এগোবে, তত তুমি আরও শক্ত হবে, তত তুমি আরও দৃঢ় হবে। তখন তিনি মেপে নেবেন যে তোমাকে সেই জ্ঞানটি দেওয়া উচিত কি না।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে, একপোয়া পাত্রে এক সের ঢেলে দিলে পাত্রেরও বিপদ আর যা ঢালা হচ্ছে সেটিরও বিপদ।

তিনি বলছেন, কেন এমন হচ্ছে? এই 'আমি' তিনিই রেখে দিয়েছেন। এই যে মতিচ্ছন্ন আমি, এই যে আবদ্ধ আমি, এই যে একক আমি, এই যে ক্ষুদ্র আমি—এই আমি তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা, তাঁর লীলা। আত্মার সাক্ষাৎকার হলে তবেই সব জানতে পারব। এই বোধটা কেমন?

এই বোধটা তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর লীলা, তাঁর খেলা। এ বোধ সকলের নয়। যার ভেতরে আত্মজ্ঞানের একটু স্ফুরণ হয়েছে, সে তখন এই কথা বলে যে, এ আমি তাঁরই আমি। এই যে দেখছ আমি খাচ্ছি, আমি পরছি, আমি ঘুরছি, আমি বেড়াচ্ছি—এটা তিনিই করাচ্ছেন।

একদিন ব্যাসদেব যমুনার তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খুব গল্প-টল্প করছেন। এবার যমুনার তীরে এসে দেখছেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, শেষ খেয়াটি চলে গেছে ওপারে। তাঁরা মহাচিন্তায় পড়েছেন। প্রত্যেকেই বাড়িতে না বলে এখানে চলে এসেছেন। এ তো পরকীয়া প্রেম। তা এবার বাড়ি ফিরে গেলে তো তাদের শাশুড়ি, ননদ, তাদের স্বামী তো পেটাবে ধরে। তাঁরা মহাচিন্তায় পড়েছেন। যমুনার তীরে তাঁদের সব দুধের কলস নামিয়ে দিয়ে মহাভাবনায় তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় ব্যাসদেব এসে হাজির। তখন সেই গোপীরা বলছেন, 'ঋষি খুব বিপদ হয়ে গেছি। নৌকা তো ওপারে চলে গেছে, এখন যাব কি করে? তুমি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পার?'

ব্যাসদেব বললেন, 'তা একটা করতে পারি। তবে তার আগে আমাকে পেটপুরে কিছু খাওয়াতে হবে।'

তাঁরা বললেন, 'আমাদের এই কলসিতে বা হাঁড়িতে বিশেষ কিছু তো নেই।

তবু দেখি চেঁছেপুঁছে কি পাওয়া যায়।'

তা যা পাওয়া গেল, মন্দ নয় একজন মানুষের পক্ষে। তিনি পেটপুরে খেলেন, উদ্‌গার তুললেন। এবার যমুনার তীরে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যমুনে, আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তুমি বিভক্ত হও। দ্বিধা হও। দ্বিধাবিভক্ত হও।'

সঙ্গে সঙ্গে যমুনার জল দুপাশে সরে গেল। পথ তৈরি হয়ে গেল। গোপীরা সব লাইন দিয়ে ব্যাসদেবসহ ওপারে চলে গেলেন।

ওপারে পৌঁছে গোপীরা প্রশ্ন করলেন, 'মুনি, এটা কিরকম মিথ্যে কথা হল? পেটপুরে খেলে, আবার যমুনাকে বললে, যদি কিছু না খেয়ে থাকি তবে তুমি দ্বিধাবিভক্ত হও। এবং যমুনাও তেমনি তোমার কথা শুনে দ্বিধাবিভক্ত হল। ব্যাপারটা তো বুঝলাম না।'

ব্যাসদেব বললেন, 'শোন, যমুনাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে আমার ব্রহ্মশক্তি। তার দেহ নেই। তার কিছুই নেই। খেয়েছে ব্যাসদেবের দেহের খোলটা। আর যিনি যমুনাকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন, তিনি তো ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি তো সেই পরমাত্মা। তিনি খানও না, তিনি হজমও করেন না।'

তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন, সবই ঈশ্বরের লীলা। আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে এ বোধ আসে না।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার এমন একটি উপমা দিচ্ছেন যার পরে আর কিছু দরকার হয় না। তার কারণ, তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ সমস্ত কিছু নিজে আত্মস্থ করেছেন। তিনি সাধন করেছেন। তোতাপুরী এসে তাঁকে 'ব্রহ্মদর্শন' করিয়েছেন। 'এ জগৎ' ও 'ও জগৎ'-এর মধ্যে তাঁর একটা যোগসেতু আছে—ক্ষণে ক্ষণে তিনি মহাসমাধিতে লীন হন।

সাধারণ জীব মহাসমাধিতে একবারই যেতে পারে এবং তারপরে একুশ দিনে তার মৃত্যু হয়। একমাত্র অবতারাদি সমাধির থেকে ফিরে আসেন ওপারের খবর নিয়ে।

তার কারণ, তিনি বলছেন যে, অবতারাদি যাঁরা মানুষকে লোকশিক্ষা দিতে আসেন, তাঁরা কেমন জানো?

একজন পাতকো খুঁড়েছিল। কোদাল, দড়ি, ঝুড়ি সব ছিল। পাতকো খোঁড়া হয়ে যাবার পর সাধারণ লোক সেগুলো ফেলে দেয়। আর কিছু লোক সেগুলো তুলে রাখে, যদি অপর কেউ পাতকো খুঁড়তে চায়, তার কাজে লাগবে।

যাঁরা ব্রহ্মবিদ, তাঁরা ঐরকম। তাঁরা যাঁর সাহায্যে যে জিনিস পেয়েছেন, যে জ্ঞান পেয়েছেন, যে চৈতন্য সমুদ্রের দর্শন পেয়েছেন—তাতে নিজেই অবগাহন করেন না। ফিরে এসে বলেন, চলো, চলো, দেখবে চলো। কেন এখানে পচে

মরছ? এখানে কেন দিন দিন সংকীর্ণ হচ্ছ? কুঁকড়ে যাচ্ছ? তুমি মানুষ। তুমি 'অনড়োনীয়ান মহতোমহীয়ান'। তুমি কেন কীটাণুকীট হয়ে যাচ্ছ? তুমি চলো।

এই হচ্ছেন অবতার।

ঠাকুর বলছেন, অবতার কি রকম জানো? আমটি খেয়ে, আঁটিটি ফেলে, মুখটি মুছে ফেলেন না। যে বাগানে আম খেয়েছেন, সবাইকে ডেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেই বাগানে ঢোকান। বলেন, এখানে আম খা।

এই হচ্ছেন অবতার।

অবতারের উদাহরণ দিতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন—তিন-চারজন সাধু একটা পথ ধরে যাচ্ছিলেন। তার ডানপাশে বিশাল একটা পাঁচিল। সবাই শুনতে পাচ্ছেন পাঁচিলের ওপারে ভয়ঙ্কর আনন্দ হচ্ছে। নাচগান, নানারকম সুরধ্বনি। এক একজন পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠছেন। ঐ দৃশ্য দেখে হা-হা করে হাসতে হাসতে ওপারে গিয়ে পড়ছেন, আর ফিরে আসছেন না। এর মধ্যে একজন সেই পাঁচিলের ওপারে উঠে হা-হা করে হাসলেন আর যাঁরা এপাশে ছিলেন, তাঁদের বললেন যে, এখানে ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে। তোমরাও সব চলে এসো। এই নাও আমি পা-টা নামিয়ে দিচ্ছি, ধরে ধরে ওঠো।

সেইজন্য অবতার সম্পর্কে ঠাকুর বলছেন, অবতার হচ্ছেন বাহাদুরি কাঠ। এমনি হাভাতে কাঠ সমুদ্রে, নদীতে ভাসছে। কেউ যদি তার ওপরে উঠে বসে, কাঠ এবং সে সবসুদ্ধ ডুবে যাবে। কিন্তু বাহাদুরি কাঠের ওপর দশ বারোজন চেপে চলে যেতে পারে।

ঠাকুর বলছেন, মনে করো মহাসমুদ্র।

তাঁর দর্শন হয়েছিল, তাই তিনি বলছেন—মনে করো, মহাসমুদ্র। তার অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। তার ভেতরে একটি ঘট রয়েছে। ঘটের অন্তরে বাহিরে জল। কিন্তু না ভাঙলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনি এই 'আমি ঘট' রেখে দিয়েছেন। সেইজন্য, ঠাকুরের ভাষায়, আমরা হচ্ছি এক একটি উপুড় করা ঘট। সেই ব্রহ্ম সমুদ্রে আমরা ভাসমান আছি এবং ঘট যেন ভাবাচ্ছে, ঘটের আকাশকেই আমরা ভাবছি এইটিই আমার আকাশ। কিন্তু ওটি ঘটাকাশ। চিদাকাশের সন্ধান আমরা পাচ্ছি না, যতক্ষণ না পর্যন্ত হয় নিজে ভাঙছি, আর না হয় কেউ এসে কৃপা করে ভেঙে দিচ্ছেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার অনন্ত জ্যোতিতে আমার সে মুক্তি সম্ভব নয়।

এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি মুক্তি পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম কি, ব্রহ্ম কাকে বলে, ব্রহ্মের সংজ্ঞা কি—এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতে পারে, গ্রন্থের পর গ্রন্থ লেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমার কোনও পরিতৃপ্তি নেই তাতে। আমার ... আমার যে কোনও উপলব্ধি হল না।

Knowledge সম্পর্কে সাইকোলজিস্টরা দুটো কথা বলেছেন। এক হচ্ছে first hand knowledge আর এক হচ্ছে second hand knowledge। ঠাকুর এ সম্পর্কেও অদ্ভুত উপমা দিচ্ছেন। কেউ শুনেছে দুধ, কেউ দেখেছে দুধ আর কেউ খেয়েছে দুধ। যে শুনেছে দুধ, তাকে বলা হয়েছে দুধ গরুতে থাকে। সাদা মতো দেখতে। তরল পদার্থ। তার মধ্যে একটু স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে। সে শুনে তাইতেই সন্তুষ্ট হয়েছে।

আর একজন একটু এগিয়ে বলেছে, আমি দেখতে চাই।

সে দেখেছে। আর কিছু করেনি।

আর একজন বলছে, না, এতেও সন্তুষ্ট নই। আমি শুনেছি এটি খাওয়া যায়। আমি খেয়ে দেখব। তখন সে খেয়ে মুখ মুছেছে। ভেতর পরিতৃপ্ত হয়েছে।

তার ঠোঁটের দুপাশে স্নেহজাতীয় ঐ দুধের ফেনা লেগেছে। সে মুখ মুছে বলছে, এইবার আমার প্রকৃত তৃপ্তি হল।

সেইজন্য ব্রহ্ম সমুদ্র সম্পর্কে, ব্রহ্ম অনুভূতি সম্পর্কে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, বহু লোক শুনেছে, নারদ দর্শন করেছে আর স্বয়ংশিব তার থেকে তিন গণ্ডুষ পান করে সংসার-ফংসার ছেড়ে দিয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছেন।

নিত্য আর লীলা।

এই সম্পর্কে ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। একথা বেদান্ত বলছে বটে, কিন্তু যতক্ষণ 'আমি' আছে, ততক্ষণ আমার লীলাও সত্য। তার কারণ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ব্রহ্মেরই মায়া এবং সেই মায়াতেই আদ্যাশক্তি মহামায়া এই জীবজগৎ রচনা করেছেন।

তুমি এখানে আছ। তুমি বলতে পারো না 'সোহম্', আমিই ব্রহ্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের 'আমি'টাকে তুমি মুছতে না পারছ, ততক্ষণ বলো না। এইবার ডাস্টার দিয়ে যদি নিজের 'আমি'টাকে মুছে দিতে পারো, তখন কি আছে তুমি নিজেও আর বলতে পারবে না।

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ লীলাও সত্য, যা ঘটছে সব সত্য। তিনি যখন কৃপা করে আমি-টাকে মুছে ফেলবেন, তখনই তুমি বলতে পারবে 'সোহম্'।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

আমি আর তুমি। এ হল একটা dual existence। এ হচ্ছে ভক্ত-ভগবানের লীলা। ঠাকুর বলছেন, আমি চিনি হতে ভালোবাসি না। আমি আর চিনি, দুটো অস্তিত্ব থাক। তার কারণ, আমি আস্বাদন করব। এবং এই মায়া এই যে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন—এই আস্বাদনটা যাতে থাকে। আমি আর তুমি। তোমাকে আমি দেখছি, আমাকে তুমি দেখছ—এই লীলাটা যেন থাকে। তা না হলে, লীলা ছাড়া এই পৃথিবী, জ্ঞানীর পৃথিবী শুষ্ক। ভক্তের পৃথিবী সরস। সেজন্য তিনি বলছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ লীলাও সত্য। আমি যখন তিনি মুছে ফেলবেন, তখন যা আছে, তাই আছে—সেটা বলার উপায় নেই, personal experience। ঐ যেমন জুং বলেছেন— 'There is only one secret, that is Brahma ! তার কারণ 'No body can say, no body can define what is Brahma What is Atma?

যার experience হয়েছে, সে আর ফিরে আসবে না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল, ফিরে আসেনি। গলে গেছে।

সেই বিরাট আমিতে, এই ক্ষুদ্র আমি যখন গুলে যাবে, তখন কোথায় পাব আমার এই ক্ষুদ্র আমিকে!

এইজন্যই বলা হয়, বিচার বন্ধ হলে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার ভেতরের ঐ বস্তুটিকে খুঁজে পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন রেডিয়োর টিউনিং। যতক্ষণ না পর্যন্ত টিউন করতে পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যসব ধ্বনি মুছে গিয়ে শুধুমাত্র সেই ধ্বনি আসবে না।

এইবার ঠাকুর বলছেন, সত্যই সত্যকে দেখায়। একথা ক্যাথলিকরা বলে এসেছে, টমাস কেম্পেস বলেছেন, সেই মানুষই blessed, যাকে সত্য এসে সত্য দর্শন করায়। ঠাকুর একটি ভারি সুন্দর গল্প বলতেন—এক রাজার কাছে একজন এসেছে ভেল্‌কি দেখাতে। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলেন, একজন ঘোড়সওয়ার আসছে ঘোড়ার ওপর চড়ে। খুব সাজগোজ তার। হাতে অস্ত্রশস্ত্র। সভাসুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার করছে—এর ভেতরে সত্য কে? এ তো জাদুকর ভেল্‌কি দেখিয়েছে। এর ভেতরে সত্য কি?

ঘোড়া তো সত্য নয়। সাজগোজ, অস্ত্রশস্ত্র সত্য নয়। শেষে সত্য, সত্য দেখালো। যে সওয়ার, সে একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবাই দেখছে সেই জাদুকর। সে-ই দাঁড়িয়ে আছে। বাকি সব আর কিছু নেই।

একথা বলেই ঠাকুর বলছেন, এর থেকেই উপলব্ধি হল, তখনই এদের উপলব্ধি হল ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই হল আত্মতত্ত্বের ব্যাপার।

অতএব, আমাদের তাহলে কি করণীয়?

আমাদের করণীয় যেটি, সে তো শুনলাম। কিন্তু সেই শোনাই শোনা যে শোনার থেকে কিছু আসে।

ঠাকুর বলছেন, বেদ, বেদান্ত, পুঁথি—তাতে অনেক জ্ঞানের কথা লেখা

আছে। পাঁজিতে বিশ আড়া জলের কথা লেখা আছে। কিন্তু তাকে ধরে কস্ কস্ করে নিংড়োলে এক ফোঁটা জলও বেরোবে না।

তাহলে এই যে একটা এতবড় আলোচনা হল, তার থেকে আমরা কি পেলাম?

অন্তত, এই বস্তুটি পেলাম যে বেঁচে থাকার নেশার ঘোর থেকে বেরিয়ে আসার। যে পৃথিবী তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, যে জীবনে প্রতিদিন মানুষের প্রতিদিনের মৃত্যু হচ্ছে, যে জীবনে বাঁচতে বাঁচতে রাজা, প্রজা, মন্ত্রী সবাই বলছে—আর ভালো লাগে না, যে বেঁচে থাকায় প্রতি মুহূর্তে আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনে হচ্ছে যে, তুমি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছ টি. এস. এলিয়টের কবিতার মতো—I am growing old, I am growing old, সেই বেঁচে থাকার নেশার ঘোর থেকে বেরিয়ে এসো।

'I will have to wear my trousers rolled'. Ultimately কি হবে? আমি ধীরে ধীরে, তিলে তিলে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। ইওরোপীয়ান শাস্ত্র বলেছেন, মরণকে ভয় পেয়ো না। Cowards die many times before their death। মৃত্যু আসবে, আসবে। যখন আসবে, তখন তুমি মরে যাবে।

আমাদের বেদান্ত বলছে, না, ইওরোপীয় কথাটা ঠিক না। তুমি মৃত্যুশরণ হও। প্রতিদিন সকালবেলা উঠে তোমার সমস্ত সংকল্পের মধ্যে একটি সংকল্প রাখো—এই জীবন, এই বেঁচে থাকা, এই ভোগ, এই ঐশ্বর্য সমস্ত কিছু অনিত্য। একদিন আমি মরে যাবো। তখনই আমার ভেতরে আর একটা মানুষ জন্মাবে। সে মানুষটা আর কেউ নয়—আমার যে পরমাত্মা, আমার জীবাত্মার কাছে সরে আসবে এবং একদিন দুজনে মিলে যাবে। একটা গান আছে, এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—

"অনন্ত হয়েছ ভালোই করেছ
থাকো চিরদিন অনন্ত অপার
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে
তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর।"

আর শেষকালে তার আশার কথা কি? "তুমিও ফুরাবে না, আমিও ফুরাব না। তোমাতে আমাতে হব একাকার।"

এইটাই হচ্ছে Realisation।

যাচ্ছ কোথায়? কোন্ দেশে? কোন্ মুলুকে?

যেখান থেকে এসেছিলাম, সেইখানেই ফিরে যাচ্ছি।

রবার্ট ফ্রস্ট-এর একটা অসাধারণ কবিতা আছে—

পথিক তুমি বনের পথ ধরে চলেছ। অনেকটা পথ গেছ। গিয়ে দেখছ যে বিশাল বড় একটি গাছ তোমার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

এ কি অবরোধ? এ কি তোমার যাত্রা থামিয়ে দিতে চাইছে?

না।

এ বলতে চাইছে, তুমি এতটা পথ হেঁটে এসেছ। এখানে একটু দাঁড়াও। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখ কি পথ ফেলে এসেছ। এবং সেই অভিজ্ঞতা তোমাকে এখন অন্য একটা শক্তি দেবে, যাতে তুমি শেষ বাধাটা উত্তীর্ণ হয়ে সেই আলোকিত জগতের দিকে চলে যাবে।

ওদের দেশেও তো বৈদান্তিক জন্মেছিলেন। তাই এমন কবিতা লিখেছিলেন।

একটি ভয়ঙ্কর সুন্দর গল্প আছে। এটি সাউথ ইন্ডিয়ান উপকথা।

একটি বিশাল মরুভূমি। সেই মরুভূমিতে গভীর অন্ধকার রাত। দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যরাতে দূর মরুভূমিতে একটা লণ্ঠন দুলছে। কে যেন কি খুঁজছে। কাছে গিয়ে দেখা গেল, এক অতি বৃদ্ধা রমণী। তিনি ঐ লণ্ঠনের আলোকে মরুভূমির বালি থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে হাড় বের করছেন। এইবার ঐ সমস্ত হাড় (অর্থাৎ bones) গুলিকে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে তিনি একটি গুহার মধ্যে ঢুকলেন। সেখানে সেই হাড় দিয়ে দিয়ে, যেন জিগ্‌স্‌ অব পাজ্‌ল্‌, তিনি একটি আকৃতি রচনা করলেন। দেখা গেল, সেটি একটি নেকড়ে বাঘ।

এবার সেটিতে তিনি মন্ত্রবলে একটি ল্যাজ লাগালেন এবং তার দেহাবয়ব তৈরি করে দিলেন। অর্থাৎ মেদ, ত্বক ইত্যাদি তৈরি করে দিলেন।

এইবার সূর্য উদিত হচ্ছেন পুব আকাশে। তিনি লণ্ঠনটি নিভিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই নেকড়ে বাঘ প্রচণ্ড শক্তিতে উঠে দাঁড়ালো এবং তীব্র বেগে দিগন্তের দিকে ছুটে গেল। সেখানে তখন সূর্য উদিত হয়েছে।

সে এক লাফ মারল আকাশের দিকে। ফিরে তাকালো একজন সুন্দরী রমণী। এইটিই হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মহামায়া। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সৃষ্টির শেষে তিনি সমস্ত বীজ সংগ্রহ করে রাখেন। যেমন গিন্নিদের একটা ন্যাতাকাঁথার হাঁড়ি থাকে, সেখানে শশার বীজ, ঝিঙের বীজ, ঢেঁড়সের বীজ এসব থাকে। এ ঠিক তারই একটি বিকল্প গল্প। তিনি সমস্ত অস্থি সংগ্রহ করে করে সমস্ত জীবের আকৃতি দিচ্ছেন এবং সূর্যের আলোয় তারা প্রাণিত হচ্ছে। এবং নিমেষে তারা যখন দিগন্তের দিকে চলে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে শক্তির মুখ। সেটি মা কালী হতে পারেন, মা দুর্গা হতে পারেন, মা জগদ্ধাত্রী হতে পারেন।

এইখানেই শুরু হচ্ছে তন্ত্র। পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন। এই বস্তুটিই হচ্ছে একটা মহাসত্য। এইটিই হচ্ছে আত্মার কথা। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। আত্মাই আত্মাকে দ্বিখণ্ডিত করছেন। আত্মাই আত্মাকে আবদ্ধ করছেন এবং গীতায় বলছেন, আত্মাই আত্মার শত্রু, আত্মাই আত্মার বন্ধু।

উপনিষদে বলা হচ্ছে, ঋষি প্রার্থনা করছেন, হে মায়া, তুমি তোমার পথ,

দ্বার আগলে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি দয়া করে, কৃপা করে সরে যাও। আমি সেই সত্যসদনে প্রবেশ করি। সেখানে ব্রহ্মের আত্মা, যোগীর পরমাত্মা এবং ভক্তের ভগবান বসে আছেন।

এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তুমি চেষ্টা করো আর নাই করো, সমস্ত গতি, সমস্ত জীবের গতি হচ্ছে তাঁর দিকে। হয়তো লক্ষ জন্ম কেটে যাবে, কিন্তু পাবে। সবাই ফিরে আসবে।

এটি কি রকম?

যেন দম দিয়ে মা সব পুতুল ছেড়ে দিয়েছেন। সে যখন চক্কর মেরে মেরে ফিরে আসবে, তখন হয়তো অনেক অনেক জন্ম কেটে গেছে। কিন্তু ফিরে তাকে আসতেই হবে।

এইবার শেষ কথাটি বলি।

এক ঋষি তাঁর দুই পুত্রকে বলেছিলেন যে, যাও গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে এসো। ছ'বছর পরে তারা দুজনে ফিরে এসেছে। এইবার সেই ঋষিপিতা জিজ্ঞাসা করছেন, ব্রহ্ম সম্পর্কে তোমার কি উপলব্ধি বড়পুত্র? সে নানারকম বলতে লাগল—তাঁর জ্যোতির্ময় শরীর, তাঁর অনন্ত শক্তি, অনন্ত বাহু, অনন্ত বীর্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঋষি বললেন, আচ্ছা বুঝেছি।

এইবার তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্রহ্ম কি?

সে পিতার সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

পিতা বললেন, হ্যাঁ তুমিই ঠিক বুঝেছ।

আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ এতদিনে এইটুকুই বুঝেছেন যে, তিনি কিছুই বোঝেন নি।

দূরে, অনেক দূরে তাই তিনি কাল। তুমি জান না, তাই তিনি কাল। তোমার অজ্ঞতাই কালী। জ্ঞানের আলোই হলেন শিব। কালীর প্রকৃত তত্ত্ব জানেন শিব। কে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর বুকে। কার এমন দুঃসাহস? তিনি হলেন খণ্ডকাল। অজ্ঞতা, অহংকার। মহাকালের খবর না রেখেই যার নৃত্য, লণ্ডভণ্ড জীবন খেলা। মহাকালের খবর পেলেই নৃত্য শান্ত। লজ্জা? জীব কাটা।

কালী শব্দটির মধ্যে কাল শব্দটি রয়েছে। মহাকালের সঙ্গে যিনি রমণ করেন তিনিই কালী। কালকে যিনি কলন করেন। খণ্ড খণ্ড করেন, বিভাজন করেন, অনন্তকে টুকরো টুকরো করেন, প্রতিটি জীবনের সময়সীমা নির্ধারণ করেন, তিনিই তো কালী। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানের অদৃশ্য রেখাটির নাম কালী। কেউ বলবেন, কালী হলেন মৃত্যু। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ভাবেই মাকে দেখেছেন, মৃত্যুরূপা কালী। তিনি বীর জীবনসাধক। মৃত্যুকে গলায় মালা পরিয়ে নরম নরম স্তোত্রে তোষণ করে ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কামের প্রত্যাশা করেন না। তিনি 'মা'-কে কিভাবে দেখছেন, কোন্ দৃষ্টিতে।

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখ বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া।।
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিকবাস, বলে মা দানবজয়ী।।
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে।।

হ্যাঁ, মৃত্যুর চেয়ে সত্য কিছু আছে কী? জীবন আসছে কোথায়? মৃত্যুর কোলে। পৃথিবী মৃত্যুর এলাকা। এখানে অক্ষয় বলে কিছু নেই। সর্বত্র ক্ষয়। শেষ থেকে শুরু। এ শেষ হল, ও হল। ও গেল তো সে এল। ডিম ফুটল, পাখি উড়ল। ফিরে এল সন্ধ্যার বাসায়। একদিন আর হল না। নতুন ডিম, নতুন বাসা, নতুন পাখনা। আকাশ যে অনন্ত! আকাশই ব্রহ্ম। পাখি মরলেও ওড়াটা থাকবে। নদী শুকোলেও প্রবাহটা থাকবে। এপার থাকলে ওপারও থাকবে। আলো আর অন্ধকার। আলোর তলায় অন্ধকার, এখানে উলটো, অন্ধকারের তলায় আলো। 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।' সাধক রামপ্রসাদ বিস্ময়ে বলছেন, 'কাল বরণ অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য কালো/যাকে হৃদয়মাঝে রাখ্লে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো।।

কোথাও একটা 'না বলা কথা' আছে। তাই এক রহস্য। [illegible] করতে পারলেই—অন্ধকারের আলো, মৃত্যুর জীবন দেখতে পাওয়া যাবে। দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামপ্রসাদের এই দুটি চরণ প্রায়ই ভক্তদের শোনাতেন,

কে জানে রে কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।।

কালীর মর্ম কে জানেন? জানেন শিব। আলোর বুকে কালোর নাচন। 'মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।' দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জাহাজে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্র তাঁকে সাদরে নিয়ে এসেছেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে ঈশ্বরের কথা শুনবেন। জল তোলপাড় করে জাহাজ চলেছে উত্তরে। আর ডেকের ওপর তোলপাড় ঈশ্বরীয় কথা।

এ এক অদ্ভুত মিলন! কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবাদী। সেখানে আকার নেই। নিরাকার অরূপ ব্রহ্ম। সেখানে এক ছাড়া দুই নেই। আর ঠাকুর হলেন ভক্ত। রূপের পূজারী। ব্রহ্মবাদী কেশবচন্দ্র এই প্রেমিক ভক্তমানুষটিকে ভালোবেসে ফেলেছেন। বুঝতে পেরেছেন। ভেতরে চিজ আছে। আলুথালু ভক্ত নন। জ্ঞানী ভক্ত। কেশবচন্দ্র শুনতে চেয়েছেন কালীতত্ত্ব। বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্তরা রয়েছেন। রয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। রয়েছেন মাস্টারমশাই 'শ্রীম'।

ঠাকুর বলছেন, 'আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। ঠাকুর কালিকাপুরাণের তত্ত্বই সহজ করে বলছেন। কালো নাম স্বয়ংদেব। দেবতাটির নাম 'কাল'। সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়ের মালিক তিনি। সৃষ্টি, স্থিতি আর ধ্বংস—এই তো কালের নিয়ম। প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি। সৃষ্টির পেছনে আছে বিরাট এক পুরুষের সৃজনেচ্ছা। তিনি ব্রহ্মা। জ্ঞানস্বরূপ প্রভু পরম ব্রহ্ম। ব্রহ্মা একা কি করবেন! তাঁর ইচ্ছা আছে, বীজ কোথায়! সে তো থাকবে স্ত্রী-শক্তির কাছে। ব্রহ্মা তাঁকে আনলেন—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে। এই প্রকৃতি হলেন মায়া। পরমেশ্বর ইচ্ছার সাহায্যে পুরুষ আনলেন। প্রকৃতি আর পুরুষ। শুরু হল মায়ার খেলা। সৃষ্টির কাজটি তিনি ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন। প্রকৃতি অর্থাৎ আদ্যাশক্তি, অর্থাৎ মহামায়া অতি নিষ্ঠুর। শ্রীশ্রীচণ্ডী কি বলছেন,

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণা।।

সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীব মোহরূপ গর্তে, মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। তিনি অন্ধকার, তিনি আলো। তিনি জ্ঞান, তিনি অজ্ঞান। তিনি মুক্তি, তিনি বন্ধন।

তিনি জীবন, তিনিই মৃত্যু। মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, কথা বলেন, খেলা করেন, তাঁর কাছে কেশবচন্দ্র কালীর কথা শুনছেন। ঠাকুর বলছেন, 'একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোনও কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপভেদ।'

কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তরা শুনছেন। শেখ অক্টোবরের অপূর্ব বৈকাল। জলযান কলকাতামুখী। অপূর্ব আসরে অতি অপূর্ব শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তির ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন, বলছেন, "যেমন 'জল', 'ওয়াটার', 'পানি'। এক পুকুরে তিন-চার ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা নিচ্ছে 'জল', আর একঘাটে মুসলমানরা নিচ্ছে 'পানি'। আর একঘাটে ইংরেজরা সংগ্রহ করছে 'ওয়াটার'। তিনিই 'এক', কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা', কেউ 'গড', কেউ বলছে 'ব্রহ্ম', কেউ 'কালী', কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।"

কেশবচন্দ্র বড় আনন্দ পেয়েছেন। ব্রহ্মের ব্যাখ্যা কালী, কালীর ব্যাখ্যা ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ও কালীর সমন্বয়ের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত—শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্র বললেন, 'কালী কতভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন।'

ঠাকুরও তাঁর মায়ের কথা বলতে পেরে মহাখুশি, 'শোনো, তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয়নি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।'

অপূর্ব ভয়ংকর তাঁর ধ্যানমূর্তি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে শক্তিসাধকের ধ্যানদর্শন—

ওঁ খড়্গং চক্রগদেষুচাপ পরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং

দশ হাত, দশ পা, দশ মুখ—তাঁকে যে দশ দিক দেখতে হবে, যেতে হবে, করতে হবে। কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া। নীলকান্তমণির মতো অঙ্গপ্রভা।

ঠাকুর বলছেন, 'শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ-বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধির ধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎনাশ হয় মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নির কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে,

আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে।'

ঠাকুরের দর্শনে, এই বিরাট সৃষ্টিতে ভয়ংকরী সদা ব্যস্ত এক মহাগৃহিনী। সৃষ্টির অঙ্গনে ঝমঝম করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম। সর্ব অঙ্গে তাঁর রকম রকম অলঙ্কার। রাজরাজেশ্বরী মা আমার। ঠাকুর মথুরবাবুর কাছে আবদার করে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীকে অনেক গয়না পরিয়েছিলেন, শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, পাঁজর, চুটকি আর জবা বিল্বপত্র। মার হাতে সোনার বাউটি, তাবিজ। অগ্রহাতে-বালা, নারিকেল ফুল, পঁইচে, বাউটি, মধ্যহাতে—তাড়, তাবিজ আর বাজু। তাবিজের ঝাঁপি টুলটুল করে দুলছে। গলায়—চিক, মুক্তোর সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারা হার, সোনার মুণ্ডমালা। মাথায়—মুকুট। কানে—কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমকো, চৌদানি আর মাছ। নাকে—নৎ, নোলক দেওয়া।

মাঝরাতে মা মন্দিরের সিঁড়িতে চপল বালিকার মতো লাফালাফি করেন। এতসব অলঙ্কারের ঝমঝম শব্দ। ঠাকুর অবাক হয়ে দেখেন। এই ক্রীড়াচঞ্চল মধুরা মাকেই তিনি কাশীতে অন্যরূপে দেখেছিলেন। মা তখন একা নয় সঙ্গে ছিলেন শিব। মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে সার সার চিতা জ্বলছে। সমাধিস্থ ঠাকুরের দর্শন হল, প্রতিটি চিতার পাশে গম্ভীরানন বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ এসে দাঁড়াচ্ছেন। মুমূর্ষুদের কানে কানে তারকব্রহ্ম নাম ঢেলে দিচ্ছেন। একে একে প্রতিটি চিতায় মা কালী আরোহণ করে নিজের হাতে অষ্টপাশ মুক্ত করে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন করে দিচ্ছেন। খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিচ্ছেন পাখি।

ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন—'সৃষ্টি নাশের পর আবার সৃষ্টি। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভেতরেই থাকেন! জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভির' কথা। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভেতর থেকে জাল বের করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।'

বেদান্তীর কালীতত্ত্ব ও তান্ত্রিকের কালীতত্ত্বে ভেদ আছে। তন্ত্রে কালী হলেন 'বর্ণময়ী'। মা প্রকাশ করে তাই বর্ণ। বর্ণমালাই বিশ্বসৃষ্টি, বিশ্বতত্ত্ব, সকল তত্ত্বের মর্মকথা প্রকাশ করে। শ্রীরামপ্রসাদ বললেন, 'কালী—পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী, তুমি বর্ণে বর্ণে নাম ধর। 'অ' থেকে যত স্বরবর্ণ আর 'ক' থেকে যত ব্যাঞ্জনবর্ণ সবই অক্ষররূপিণী কালী। মাতৃকা থেকেই বর্ণ আর মাতৃকাবর্ণই মুণ্ড আর মুণ্ডমালা। উপনিষদ আর তন্ত্র কেমন এক জায়গায় এসে মিলছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদ বলছেন, অকার, উকার, মকার, চন্দ্রকলা ও বিন্দুর মিলনে—ওঙ্কার। এই অউম—ওঁ—সৃষ্টির আদিরূপ। এর তো বিনাশ নেই। 'প্রথম আদি ভব শক্তি।' গীতা বলছেন—'অক্ষরং পরমংব্রহ্মাং'। তাহলে আমরা কোথায় এলুম। অক্ষরমালা, বর্ণমালা আর

মাতৃকাবর্ণমালা—অর্থাৎ অ থেকে ম পর্যন্ত যার পরিসর তা ওই একটি প্রণবে গাঁথা—ওঁ। আচার্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকায় বললেন, ওঙ্কারতত্ত্বের প্রথম পাদ 'অ'—মা রাখলেন মহাকালের বুকে, শেষ পাদ 'ম'—মায়ের দ্বিতীয় পদ শিবের পায়ে। মাঝে একটি 'উ'। এই বর্ণটি সেতু, মালার সুতো। পঞ্চাশংবর্ণমালাকে ওঙ্কারে নিবিষ্ট করেছে। মায়ের গলার মুণ্ডমালা আসলে—ওঁ। মাথার ওপরে অর্থাৎ ও-এর মাথায় যে অর্ধচন্দ্রকলা, তিনি হলেন প্রকৃতি (ʋ) আর বিন্দুটি প্রকৃতির আধার 'ব্রহ্ম'। দুজনে এই ভাবে বিরাজ করছেন—ঁ।

মায়ের জিভটি কেন বেরিয়ে আছে? এই জিভ রহস্যময় বর্ণের প্রতীক। জিভ ছাড়া বর্ণ প্রকাশিত হবে না, উচ্চারিত হবে না। দন্তবর্ণ, তালব্য বর্ণ, ওষ্ঠ বর্ণ, জিভকেই নানাভাবে নেড়ে বাইরের জগতে প্রকাশ করতে হবে। এর নাম 'বৈখরী' অর্থাৎ ব্যক্ত ও বাহ্য নাদ। শোনা গেল। শব্দ হল। কিন্তু যা শোনা গেল না, যা ভেতরে রইল, সেটি আন্তরনাদ। এর আবার তিনটি রকম—পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা। কি অপূর্ব! এবার আমি কোথায় এলুম! রহস্যের কোন্ কিনারায়!

এই যে তিনটি আন্তরনাদ—পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা—এটি অমৃতলোকে তিনটি পদে—'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'। একটি পা কণ্ঠে—নাও কথা বল, লোকে শুনবে, ভাব, ভাবনা বেড়াতে বেরোবে। আর একটি পা হৃদয়ে, আর একটি নাভিতে। এই যে নাদের বহির্বিকাশ—এইটিই কালীর প্রসারিত জিভ।

তত্ত্বময়ী কালীর মূল তত্ত্ব হল—বর্ণবিকাশ। অকার, উকার, মকার, চন্দ্রকলা ও বিন্দু। সমগ্র বিশ্বচরাচর বিচিত্র বর্ণ ও শব্দের এক মহাসঙ্গীত। বর্ণ আর শব্দ হলেন—পার্বতী আর পরমেশ্বর। অর্ধনারীশ্বর। বেদান্তের ওঙ্কার আর তন্ত্রের 'অবিচ্ছুরিত ও অখণ্ড নাদতনু-কুণ্ডলিনী একই পরমতত্ত্ব।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বললেন, ব্রহ্ম ও কালী এক।

রামপ্রসাদের কালীসাধনা

'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'আজ্ঞে আমি বলতে চাইছি আপনার ওই মুহুরি রামপ্রসাদ সেনকে পত্রপাঠ সেরেস্তা থেকে বিদায় করুন।'

'কেন?'

'এই দেখুন মোটামোটা হিসেবের খাতা। পাতায় পাতায় যেখানে ফাঁক পেয়েছে সেখানেই শ্রীদুর্গা নাম লেখা আর যেখানে একটু বেশি জায়গা পেয়েছে সেখানেই লাইনের পর লাইন কবিতা।'

জমিদারমশাই গম্ভীর সুরে বললেন, 'দেখি একটা খাতা।'

চামড়াবাঁধাই একটি হিসেবের খাতা মালিকের ডেস্কের ওপর, চোখে চশমা লাগালেন। ঝুঁকে পড়লেন হিসেবের খাতার ওপর। খাতার পর খাতা উলটে যাচ্ছেন। একদিকে চলেছে আয়-ব্যয়ের হিসেব আর একদিকে চলেছে লাল কালিতে লেখা শ্রীদুর্গানাম। বিষয় আর অ-বিষয়ের স্রোত সমান্তরালে নামছে আর উঠছে। একটি পাতায় হিসেব যেখানে শেষ হয়েছে তারপরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে লেখা হয়েছে—

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব, আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্ধঅঙ্গ জায়গির, মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি॥
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি॥
ও পদের মত পদ পাই তো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥

জমিদারমশাই আর পাতা ওলটালেন না, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। যিনি অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন তিনি ভাবছেন এইবার হবে এক মহা বিস্ফোরণ-গর্জন—উসকো নিকাল দো। তিনি ইতিমধ্যে সেরেস্তায় অপকর্মকারী ওই রামপ্রসাদকে বরখাস্ত করে এসেছেন। এইবার হুজুর দেবেন গলাধাক্কা!

চশমাটি চোখ থেকে খুলে পাশে রেখে হুজুর কিছুক্ষণ জানলার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখের কোণে জল। শীতলগলায় বললেন, 'কোথায় এই রামপ্রসাদ সেন? ডাকুন তাঁকে।'

কিছু বুঝতে না পেরে অভিযোগকারী উঠান পেরিয়ে সেরেস্তার দিকে ছুটলেন। সেখানে সারি সারি ডেস্ক, নানা বয়েসের একাধিক মানুষ, তাঁদেরই মধ্যে একজন, অভিযুক্ত এই রামপ্রসাদ সেন। অতি সুপুরুষ চেহারার একজন মানুষ। গৌরবর্ণ, উন্নতনাসা, টানাটানা ভাবালু দুটি চোখ। মাথায় কালো চুলের বাবরি। প্রশস্ত বক্ষ। সুঠাম উন্নত দেহ। তাঁকে জানানো হল—কাছারিতে তোমার তলব হয়েছে।

অন্যমনস্ক, ভাবস্থ রামপ্রসাদ ঘরে ঢুকতেই জমিদারমশাই তাঁর দিকে হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বসুন বসুন।' রামপ্রসাদ বসলেন। জমিদারমশাই বললেন, 'অপূর্ব অপূর্ব! আপনি অন্য জগতের মানুষ। আমার মতো এক বিষয়ীর খাঁচায় আপনার মতো একজন মুক্ত-আকাশের পাখিকে ভরে রাখাটা মহাপাপ। আপনি পৃথিবীতে এসেছেন অনেক বড় কাজ করার জন্যে। আজ থেকে আপনার ছুটি, আমি প্রতিমাসে আপনার ঠিকানায় তিরিশটি করে টাকা মাসোহারা হিসেবে পাঠিয়ে দেব। আপনি মায়ের নাম করুন, সাধনভজন করুন, বদ্ধ মানুষকে মুক্তির পথ দেখান।'

রামপ্রসাদ শুধু তিনবার বললেন, মা, মা, মা। সারাঘর মায়ের নামে ঝনঝন করে উঠল।

অভিযোগকারী অবাক হয়ে গেছেন। এ যে দেখি, উলটো বুঝলি রাম! জমিদারমশাই তাঁকে আরও অবাক করে দিয়ে বললেন, 'দাসবাবু, আমি আপনারও মাইনে বাড়িয়ে দিলাম। কারণ আপনার কৃপায় এমন এক মানুষের সঙ্গে আমার আজ পরিচয় হল। আহা কী লেখা, আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী! আজ বাদে কাল আমরা মরে ভূত হয়ে যাব, কিন্তু প্রসাদের এই গান আকাশে বাতাসে ভাসবে। মানুষের মুখে মুখে ঘুরবে। রামপ্রসাদ আপনি ভক্ত, আপনি সাধক। আমার মতো কুচো জমিদারের সেরেস্তার হিসাবনিকাশের খাতা লেখা আপনার কাজ নয়। আপনার সংসারের চিন্তা আমি ঘুচিয়ে দিলুম। আপনি বাড়ি ফিরে গিয়ে শ্যামা মাকে ডাকুন।'

জমিদারমশাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে রামপ্রসাদের করমর্দন করলেন আর তাঁর কর্মচারী দাসবাবুকে বললেন, 'আপনি কিছু বোঝেননি, কার নামে কী অভিযোগ করতে এসেছেন! রামপ্রসাদ পাগল নন, আমার সেরেস্তার সামান্য মুহুরি নন, রামপ্রসাদ একজন অসাধারণ মানুষ। রামপ্রসাদকে বললেন, 'সাধক ফিরে যান আপনার হালিশহরে। আমিই আপনার দায়িত্ব নিলুম। আমার সেরেস্তার তহবিলদারি নয় মায়ের তবিলদারি আপনার জন্যে! মাঝেমধ্যে এসে কৃপা করে

আমাকে মায়ের নাম শুনিয়ে যাবেন।'

রামপ্রসাদ আনন্দে তৎক্ষণাৎ গাইলেন—'ডুব দে মন কালী বলে/হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে/রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলে/তুমি দমসামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে!'

কে এই জমিদার?

কেউ বলেন, ভূ-কৈলাশের রাজা, কেউ বলেন গরানহাটার দুর্গাচরণ মিত্র, কেউ বলেন বাগবাজারের মদনমোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গোকুল মিত্র। আবার কেউ কেউ বলেন, খিদিরপুরের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। আবার এমনও শোনা যায় হুগলিতে গোকুল সরকার নামে একজন ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। রামপ্রসাদ তাঁর সেরেস্তার মাসিক আট টাকা বেতনে মুহুরিগিরি করতেন। তাঁরই সেরেস্তার হিসেবের খাতা রামপ্রসাদ গান লিখে ভরিয়েছিলেন। তিনিই প্রসাদকে নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়ে সসম্মানে তিরিশ টাকা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে রামপ্রসাদকে মানুষের দাসত্ব থেকে চিরমুক্তি দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী শতকের আর একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর এক জাঁদরেল জমিদার জানবাজারের মথুরামোহন, মায়ের নামে আর এক পাগল শ্রীরামকৃষ্ণকে এইভাবেই নিজের হৃদয়ে দেবজ্ঞানে স্থাপন করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির একদল কর্মচারী জানবাজারে ছুটে গিয়েছিলেন নালিশ জানাতে—ছোট ভট্চাজ অনাচারে মায়ের মন্দিরের সর্বনাশ করে দিলে। নিজের মুখ থেকে এঁটো খাবার বার করে মায়ের মুখে গুঁজে দিচ্ছে, ভোগের অগ্রভাগ বেড়ালকে খাওয়াচ্ছে, মায়ের কোলে চড়ে বসছে। মায়ের রুপোর খাটে নিজে গিয়ে শুয়ে পড়ছে! জমিদার মথুরামোহন হঠাৎ তদন্তে এলেন, থামের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ছোট ভট্চাজ শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা দেখে জানবাজারে ফিরে গিয়ে রাসমণিকে বলেছিলেন—'অলৌকিক এক দেবমানব মন্দিরে এসেছেন, পাথরপ্রতিমা জেগে উঠেছেন। আপনি দেখবেন আপনার ওই মন্দির ইতিহাস হয়ে যাবে।'

ইতিহাস এইভাবেই ফিরে ফিরে আসে। জনৈক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেছিলেন, 'কেউ বলে আমি রামপ্রসাদ আবার কেউ বলে আমি রাজা রামকৃষ্ণ। আমি জানি, আমি মায়ের ছেলে।'

॥ ২॥

অনেকে অনেকরকম বলেন কিন্তু গ্রহণযোগ্য তারিখটি হল ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দ। রামপ্রসাদ এই বছরেই পৃথিবীতে এসেছিলেন। জায়গাটির নামে কুমারহট্ট হাবেলি

শহর। হাবেলি শহর থেকে হালিশহর। অষ্টাদশ শতকের একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক অঞ্চল এই হালিশহর। এই হালিশহরেই একদা ছিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। চৈতন্যভাগবতে আছে—রঘু বোলে কুমার হট্টেরে নমস্কার / শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখছেন—বামদিকে হালিশহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী/দু-কূলের যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি। লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান বাসহীন তিল ধেনু কেহ করে দান।। রামপ্রসাদ নিজে লিখছেন—ধরাতলে ধন্য সে-ই কুমারহট্ট গ্রাম/তত্র মধ্যে সিদ্ধ পীঠ রামকৃষ্ণ ধাম/শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা/নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা।।

রামপ্রসাদ যখন জন্মালেন তখন বাংলার নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। রামপ্রসাদের বয়েস যখন দু'বছর মুর্শিদকুলি খাঁ তখন মারা গেলেন। নবাব হলেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন। তিনি ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ, ধার্মিক আর ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী। রামপ্রসাদের বয়েস যখন ষোল তখন সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হল। বাংলার নবাব হলেন তাঁর অপদার্থ পুত্র সরফরাজ খাঁ। বিহারের সুবাদার আলিবর্দি খাঁ এই অক্ষম নবাবকে পরাজিত করে বাংলার নবাব হলেন। রামপ্রসাদ তখন পরিপূর্ণ যুবক।

এইবার আমরা রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষের ধারা অনুসরণ করি। রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের আত্মপরিচয় লিখছেন—'ধনবন্ত মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল, কৃত্তিবাস তুল্য কীর্তি কই।' পূর্বপুরুষদের মধ্যে কীর্তিমান কৃত্তিবাস ছিলেন শাক্ত, দানশীল, দয়াবান শিষ্ট শান্ত। এই বংশে পর পর বহু গুণী মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অবশেষে রামেশ্বর। রামেশ্বর ছিলেন রামপ্রসাদের পিতামহ। তিনি ছিলেন শক্তি সাধক। রামেশ্বরের পুত্র রামরাম রামপ্রসাদের পিতা। রামপ্রসাদ পিতার সম্পর্কে লিখেছেন—'মহাকবি গুণধাম।' রামরাম সেন ধনী ছিলেন না, সঙ্গতিপন্নও ছিলেন না, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ সমাজহিতৈষী মহাপ্রাণ ব্যক্তি। যেমন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। রামরাম সেন শুধু নিজে ধর্মানুষ্ঠান ও সাধনভজন করে তৃপ্তি পেতেন না, পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি ধর্মানুষ্ঠান করতেন। উদ্দেশ্য ছিল সকলেই যাতে সুপথের পথিক হতে পারে।

বালক রামপ্রসাদের কাছে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল আদর্শ। বালক প্রতিদিন ভোরে চোখ মেলে দেখতেন পিতা গঙ্গাস্নানে চলেছেন। রামপ্রসাদও সঙ্গী হতেন। স্নান সেরে সিক্তবসনে পিতা ফিরছেন, বিবিধ স্তবস্তোত্র ও শ্লোক পাঠ করতে করতে। বাগানে ফুল তুলছেন গান গাইতে গাইতে। আর কিছু না থাক বাড়ির চারপাশে একটি মনোরম বাগান ছিল। সেখানে আম নারকেল কাঁঠাল ও সুপুরিগাছ, বহু ফুলগাছ। ভোরবেলা বালকের চোখে পড়ত প্রসন্ন নীল আকাশের

তলায় ফুলে ফুলে ভরা অজস্র গাছ। সুঠাম এক ব্রাহ্মণ, তাঁর অনাবৃত শুভ্র পিঠে সাদা পৈতা, গলায় একটি রুদ্রাক্ষের মালা; ফুলে ফুলে তাঁর সাজি ভরে উঠছে। আর গানে গানে গেয়ে যাচ্ছে আকাশ! এরপরে শুরু হত মহাকালীর পূজা। মহাদেবীর চরণ চন্দন কুঙ্কুমে চর্চিত। ধূপ জ্বলছে, পঞ্চপ্রদীপে আরতি হচ্ছে। সবশেষে বালক পুত্রকে আহ্বান করে পিতা বলতেন—রামপ্রসাদ, মায়ের রক্ত-চরণে অঞ্জলি দাও।

কে এই রামপ্রসাদ?

তিনি শাক্ত বীজ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর জিহ্বায় মা প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। মাকালী ছিলেন তাঁর বাগীশ্বরী। অনর্গল রামপ্রসাদের কণ্ঠ দিয়ে মা কথা বলতেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন—আমি ভাবমুখে থাকি। তাঁর প্রতি মায়ের আদেশও ছিল—তুই ভাবমুখে থাক। শাস্ত্রজ্ঞান সাধনভজন সবই করে, কিন্তু জ্ঞানের ঊর্ধ্বে হল ভাব। ভাব হল ভক্তির স্বরূপ। রামপ্রসাদও ঠিক তাই, তাঁর জ্ঞানের অভাব ছিল না। তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, তিনি মৌলবির কাছে গিয়ে পারস্য ভাষা ও উর্দু ভাষা শিখেছিলেন। এমনকি এক মতে আছে তিনি ইংরেজ কোম্পানির সেরেস্তাতেও কিছুকাল কেরানিগিরি করেছিলেন। অবশেষে সব ছেড়ে দিয়ে তিনি সমর্পিত হয়েছিলেন মাতৃচরণে। রামপ্রসাদের নিজের একটি লেখায় আমরা এর একটা ইঙ্গিত পাই—

যখন ধন উপার্জন করেছিলাম দেশবিদেশে,
তখন ভাই বন্ধু দারাসুত, সবাই ছিল আমার বশে
এখন ধন উপার্জন নাই, আমায় দেখে সবাই রোষে।

রামপ্রসাদের সাধনতত্ত্ব হল—'মা বিরাজে ঘরে ঘরে', আর একটি হল 'জননী তনয়া জায়া সহদরা কি অপরে।' সবই এক। মা বিরাজে সর্বঘটে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, মন্দিরের মা, গর্ভধারিণী মা ও সহধর্মিণী—তিনে এক, একে তিন।

পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদকে রোজগারের জন্যে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। আশ্রয় নিয়েছিলেন ভগ্নীপতী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বাড়িতে। শ্রীরামকৃষ্ণও এসেছিলেন কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুরে। রামপ্রসাদ পেলেন তিরিশ টাকা মাসোহারা আর শ্রীরামকৃষ্ণ পেলেন রানী রাসমণির সাত টাকা। দুই শাক্ত সাধকের অদ্ভুত মিল! ব্যবধান একটি শতাব্দীর।

রামপ্রসাদ ছিলেন তান্ত্রিক। তাঁর বয়েস যখন সতেরো আঠারো বছর তখন ভাজনঘাট নিবাসী লোকনাথ দাসগুপ্তের কন্যা যশোদা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সর্বাণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভক্তিমতী, স্বামীর অনুগত। স্বামীর আদর্শে তাঁর চরিত্র গঠন করেছিলেন। একদিন

শহর। হাবেলি শহর থেকে হালিশহর। অষ্টাদশ শতকের একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক অঞ্চল এই হালিশহর। এই হালিশহরেই একদা ছিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। চৈতন্যভাগবতে আছে—রঘু বোলে কুমার হট্টেরে নমস্কার / শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখছেন—বামদিকে হালিশহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী/দু-কূলের যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি। লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান বাসহীন তিল ধেনু কেহ করে দান।। রামপ্রসাদ নিজে লিখছেন—ধরাতলে ধন্য সে-ই কুমারহট্ট গ্রাম/তত্র মধ্যে সিদ্ধ পীঠ রামকৃষ্ণ ধাম/শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা/নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা।।

রামপ্রসাদ যখন জন্মালেন তখন বাংলার নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। রামপ্রসাদের বয়েস যখন দু'বছর মুর্শিদকুলি খাঁ তখন মারা গেলেন। নবাব হলেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন। তিনি ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ, ধার্মিক আর ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী। রামপ্রসাদের বয়েস যখন ষোল তখন সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হল। বাংলার নবাব হলেন তাঁর অপদার্থ পুত্র সরফরাজ খাঁ। বিহারের সুবাদার আলিবর্দি খাঁ এই অক্ষম নবাবকে পরাজিত করে বাংলার নবাব হলেন। রামপ্রসাদ তখন পরিপূর্ণ যুবক।

এইবার আমরা রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষের ধারা অনুসরণ করি। রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের আত্মপরিচয় লিখছেন—'ধনবন্ত মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল, কৃত্তিবাস তুল্য কীর্তি কই।' পূর্বপুরুষদের মধ্যে কীর্তিমান কৃত্তিবাস ছিলেন শাক্ত, দানশীল, দয়াবান শিষ্ট শান্ত। এই বংশে পর পর বহু গুণী মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অবশেষে রামেশ্বর। রামেশ্বর ছিলেন রামপ্রসাদের পিতামহ। তিনি ছিলেন শক্তি সাধক। রামেশ্বরের পুত্র রামরাম রামপ্রসাদের পিতা। রামপ্রসাদ পিতার সম্পর্কে লিখেছেন—'মহাকবি গুণধাম।' রামরাম সেন ধনী ছিলেন না, সঙ্গতিপন্নও ছিলেন না, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ সমাজহিতৈষী মহাপ্রাণ ব্যক্তি। যেমন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। রামরাম সেন শুধু নিজে ধর্মানুষ্ঠান ও সাধনভজন করে তৃপ্তি পেতেন না, পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি ধর্মানুষ্ঠান করতেন। উদ্দেশ্য ছিল সকলেই যাতে সুপথের পথিক হতে পারে।

বালক রামপ্রসাদের কাছে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল আদর্শ। বালক প্রতিদিন ভোরে চোখ মেলে দেখতেন পিতা গঙ্গাস্নানে চলেছেন। রামপ্রসাদও সঙ্গী হতেন। স্নান সেরে সিক্তবসনে পিতা ফিরছেন, বিবিধ স্তবস্তোত্র ও শ্লোক পাঠ করতে করতে। বাগানে ফুল তুলছেন গান গাইতে গাইতে। আর কিছু না থাক বাড়ির চারপাশে একটি মনোরম বাগান ছিল। সেখানে আম নারকেল কাঁঠাল ও সুপুরিগাছ, বহু ফুলগাছ। ভোরবেলা বালকের চোখে পড়ত প্রসন্ন নীল আকাশের

তলায় ফুলে ফুলে ভরা অজস্র গাছ। সুঠাম এক ব্রাহ্মণ, তাঁর অনাবৃত শুভ্র পিঠে সাদা পৈতা, গলায় একটি রুদ্রাক্ষের মালা; ফুলে ফুলে তাঁর সাজি ভরে উঠছে। আর গানে গানে গেয়ে যাচ্ছে আকাশ! এরপরে শুরু হত মহাকালীর পূজা। মহাদেবীর চরণ চন্দন কুঙ্কুমে চর্চিত। ধূপ জ্বলছে, পঞ্চপ্রদীপে আরতি হচ্ছে। সবশেষে বালক পুত্রকে আহ্বান করে পিতা বলতেন—রামপ্রসাদ, মায়ের রক্ত-চরণে অঞ্জলি দাও।

কে এই রামপ্রসাদ?

তিনি শাক্ত বীজ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর জিহ্বায় মা প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। মাকালী ছিলেন তাঁর বাগীশ্বরী। অনর্গল রামপ্রসাদের কণ্ঠ দিয়ে মা কথা বলতেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন—আমি ভাবমুখে থাকি। তাঁর প্রতি মায়ের আদেশও ছিল—তুই ভাবমুখে থাক। শাস্ত্রজ্ঞান সাধনভজন সবই করে, কিন্তু জ্ঞানের ঊর্ধ্বে হল ভাব। ভাব হল ভক্তির স্বরূপ। রামপ্রসাদও ঠিক তাই, তাঁর জ্ঞানের অভাব ছিল না। তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, তিনি মৌলবির কাছে গিয়ে পারস্য ভাষা ও উর্দু ভাষা শিখেছিলেন। এমনকি এক মতে আছে তিনি ইংরেজ কোম্পানির সেরেস্তাতেও কিছুকাল কেরানিগিরি করেছিলেন। অবশেষে সব ছেড়ে দিয়ে তিনি সমর্পিত হয়েছিলেন মাতৃচরণে। রামপ্রসাদের নিজের একটি লেখায় আমরা এর একটা ইঙ্গিত পাই—

যখন ধন উপার্জন করেছিলাম দেশবিদেশে,
তখন ভাই বন্ধু দারাসুত, সবাই ছিল আমার বশে
এখন ধন উপার্জন নাই, আমায় দেখে সবাই রোষে।

রামপ্রসাদের সাধনতত্ত্ব হল—'মা বিরাজে ঘরে ঘরে', আর একটি হল 'জননী তনয়া জায়া সহদরা কি অপরে।' সবই এক। মা বিরাজে সর্বঘটে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, মন্দিরের মা, গর্ভধারিণী মা ও সহধর্মিণী—তিনে এক, একে তিন।

পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদকে রোজগারের জন্যে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। আশ্রয় নিয়েছিলেন ভগ্নীপতী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বাড়িতে। শ্রীরামকৃষ্ণও এসেছিলেন কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুরে। রামপ্রসাদ পেলেন তিরিশ টাকা মাসোহারা আর শ্রীরামকৃষ্ণ পেলেন রানী রাসমণির সাত টাকা। দুই শাক্ত সাধকের অদ্ভুত মিল! ব্যবধান একটি শতাব্দীর।

রামপ্রসাদ ছিলেন তান্ত্রিক। তাঁর বয়েস যখন সতেরো আঠারো বছর তখন ভাজনঘাট নিবাসী লোকনাথ দাসগুপ্তের কন্যা যশোদা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সর্বাণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভক্তিমতী, স্বামীর অনুগত। স্বামীর আদর্শে তাঁর চরিত্র গঠন করেছিলেন। একদিন

এই মহীয়সী মহিলা স্বপ্নে দেখলেন, মা জগদম্বা সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'তোমার স্বামীকে রামকৃষ্ণ মণ্ডপের সিদ্ধপীঠে সাধন করতে বল, তাহলে আমি দেখা দেব।' পরবর্তীকালে সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ অভিমান করে মা-কে গানে বলেছিলেন---

ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে।।
জন্মে জন্মে—বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব।।
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস দাস দাসী পুত্র হই।।

হালিশহরের শিবের গলিতে একখণ্ড পতিত জমি ছিল। সবাই সেই জমিটিকে বলত রামকৃষ্ণ মণ্ডপ। কারণ প্রবাদ ছিল, ওই জায়গায় লক্ষ বলি হয়েছে, কোটিবার হোম হয়েছে, কোটিবার মহাবিদ্যার নাম জপ সঞ্চিত আছে ওই পীঠস্থানে। রামপ্রসাদ এই সিদ্ধপীঠে পঞ্চমুণ্ডি আসন স্থাপন করলেন। তন্ত্রসাধনায় পঞ্চমুণ্ডির আসন অপরিহার্য। দুটি চণ্ডালের মুণ্ড, একটি শৃগালের মুণ্ড, একটি বানরের মুণ্ড আর একটি সর্পের মুণ্ড, এই পাচটি মুণ্ড দিয়ে তৈরি হল সাধকের আসন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে চার বর্গ হাত স্থান ঘেরা হল। পুব দিকে অশ্বত্থ, উত্তরে বেল, পশ্চিমে বট, দক্ষিণে আমলকী আর অগ্নিকোণে অশোক বৃক্ষ। এই পাঁচটি গাছে তৈরি হল পঞ্চবটী। রক্তজবার গাছ দিয়ে ঘেরা পাশে পাশে মাধবীলতা আর কৃষ্ণা অপরাজিতার বেষ্টনী।

রামপ্রসাদ ছিলেন বীর সাধক। যাঁরা বীর সাধক তাঁদের বীর তন্ত্রের মত অনুসারে কৃষ্ণ কিংবা শুক্লপক্ষের অষ্টমী অথবা চতুর্দশীতে বীর সাধন করার নির্দেশ আছে। তবে প্রশস্ত হল কৃষ্ণপক্ষ। সার্ধ প্রহর রাত্রি গত হলে চিতার স্থান থেকে একটি শব এনে যথাবিহিত সাধন করতে হয়। কোনও রকম ভয় পেলে চলবে না। কোনও দিকে তাকানো চলবে না। একাগ্র চিত্তে মন্ত্রজপ। কোনও ভাবে টলে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। এই আসনকে বলা হয় সিদ্ধাসন। এক মঙ্গলবার কৃষ্ণা চতুর্দশীর গভীর রাতে নিথর অন্ধকারে বীর সাধক রামপ্রসাদ সিদ্ধাসনে বসলেন। যেমন হয়, সাধককে বিচলিত করার জন্যে নানা রকমের ভয় আসতে লাগল। ভৈরব, বেতাল এরা সব চারপাশে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করল। বীভৎস অট্টহাসি, বিচিত্র সব শব্দ। সাধক নিশ্চল। রামপ্রসাদ গভীর ধ্যানমগ্ন। হৃদয়ে শ্যামা মায়ের নামজপ। এইবার এল বড় বড় সাপ, এল বাঘ আর ভাল্লুক। সমবেত গর্জন। রামপ্রসাদ তাঁর শবসাধনার এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা একটি গানে লিখেছেন---জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো/জগদম্বার কোটাল/জয়

জয় ডাকে কালী/ঘন ঘন করতালি/বম বম বাজাইয়া গান/ভক্তে ভয় দর্শাবারে/চতুষ্পার্শ্বে শূন্যাগারে/ক্রমে ভূত-ভৈরব বৈতাল/অর্ধচন্দ্র শিরে ধরে/ভীষণ ত্রিশূল করে/আপাদ লম্বিত জটাজাল/শমন সমান দর্প/প্রথমেতে চলে সর্প/পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল/ভয় পায় ভূতে মারে/আসনে তিষ্ঠিতে নারে/সম্মুখে ঘুরায়ে চক্ষু লাল। রামপ্রসাদ বসে আছেন আসনে—বিভীষিকা সে কি মানে/বসে থাকে বীরাসনে/কালীর চরণ করে ঢাল। রামপ্রসাদ মা মা ডাকে বিভীষিকা দূর করে দিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে ভূত প্রেতের খিল খিল হাসি—'সাধক, এখনও সময় আছে এই পথ ছাড়। যদি না ছাড় এখনই তোমাকে খাব।' অন্ধকারে কালো কালো হাত এগিয়ে আসছে, এই বুঝি ধরে। এক এক হুঙ্কারে রামপ্রসাদ তাদের উড়িয়ে দিতে লাগলেন। অবশেষে মা এলেন। জ্যোতির্মণ্ডলে জগদম্বার করুণাঘন মূর্তি। মায়ের মধুর কণ্ঠস্বর—'বৎস মাভৈঃ, আমি এসেছি। হৃদপদ্মে ভাবনেত্রে আমাকে দেখ।' মুহূর্তে মোহান্ধকার দূর হয়ে গেল। উচ্ছ্বসিত জ্যোতিসমুদ্রে বিলীন হলেন সাধক রামপ্রসাদ। এল সঙ্গীত। মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিলেন তাঁর অনুভূতিলব্ধ এই গানটি :

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যাতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে।।
মা শব্দে ঘনঘন গর্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে।।
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষ্ণাভয় ঘুচিল সত্বরে।।
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে।।

॥ ৩॥

রামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ করলেন। মা তাঁকে দর্শন দিলেন। কাঙ্ক্ষিত, ইষ্টপদ লাভ করলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন। তিনি বীরাচারী তান্ত্রিক, তিনি কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জানতেন কুণ্ডলিনী জাগ্রতা না হলে সাধকের জীবনে উচ্চ অনুভূতি আসে না। সেই কারণেই পঞ্চমকারের সাধন, সেই কারণেই পঞ্চমুণ্ডির আসন নির্মাণ, সেই কারণেই কারণ সেবা, সেই কারণেই সিদ্ধাসন, সেই কারণেই শবসাধন। রামপ্রসাদের কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে মূলাধার থেকে সুষুম্মাপথে ষট্চক্রের প্রতিটি চক্র প্রস্ফুটিত করতে করতে বিশুদ্ধ চক্রে গিয়ে স্থিত হলেন। সঙ্গীত হল শ্রীরামপ্রসাদের অন্যতম সাধন মাধ্যম। গান আর গান, মুখে মুখে গান। তন্ত্রের পথে তিনি ভক্তিলাভ করলেন। তিনি পরিচিত হলেন ভক্ত রামপ্রসাদ

নামে। পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে তিনি দিবারাত্র গান গাইতেন। সেই গানে মুগ্ধ হয়ে হালিশহরবাসীরা ছুটে ছুটে আসেন। অদূরেই গঙ্গা, নদীবক্ষে যত নৌকা যেত সেই নৌকার আরোহীরা ওই গানে মুগ্ধ হয়ে বলাবলি করতেন—কে গাইছেন, কার এই গান!

তখন একদিকে চলেছে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার রাজত্বকাল আর অন্য দিকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসন সুখ্যাতি। তিনি তখন হয়ে উঠছেন কিংবদন্তি-তুল্য এক নৃপতি। তাঁর নবরত্ন সভার খ্যাতি দেশে বিদেশে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারি ছিল এই কুমারহট্টে। তিনি একদিন তাঁর কাছারিতে বসে আছেন। সময়টা সন্ধ্যা হয় হয়। হঠাৎ তাঁর কানে এল একটি গানের লাইন—'এখন সন্ধ্যা-বেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।' মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ভৃত্যকে প্রশ্ন করলেন—'হ্যাঁরে তুই বলতে পারিস এ গান কোথা থেকে আসছে! কে গাইছে?' ভৃত্য উত্তর দিল—'মহারাজ, এই কাছেই শিবের গলি। সেখানে এক সাধক আছেন, তাঁর নাম শ্রীরামপ্রসাদ সেন। তিনি সব সময় শ্যামা মাকে গান গেয়ে ডাকেন। গানই তাঁর সাধনা।'

মহারাজ বললেন—'চল্, আমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দে। আমি এখনই দেখা করব।'

কুমারহট্ট পল্লীতে মহারাজের একটি সুন্দর কাছারিবাড়ি ছিল। বহু কারুকার্য-মণ্ডিত দেবমন্দিরও ছিল সেখানে আর ছিল রাজবাড়ি। তিনি মাঝে মাঝেই কৃষ্ণনগর থেকে এসে গঙ্গাতীরবর্তী এই মনোরম জায়গাটিতে কিছুদিন থাকতেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভৃত্যটিকে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে শিবের গলিতে রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডির আসনের কাছে এলেন। বট বিল্ব অশ্বত্থ ঘেরা মাধবীলতার বেড়ার আড়ালে নির্জন সেই স্থানে বসে আছেন ভাবমগ্ন রূপবান সাধক শ্রীরামপ্রসাদ। মহারাজ অশ্বত্থ বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করে দেখছেন সেই দৃশ্য। সাধক উদাত্ত কণ্ঠে গাইছেন—'এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।' চাঁদ উঠেছে আকাশে। পূর্ণচন্দ্র। ঝলমল করছে চারপাশ, গাছের পাতা। চাঁদের আলোয় গাছের পাতা ধুয়ে যাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মতো যেন ঝরছে। রামপ্রসাদের মাথার ওপর ঝুলে আছে অশ্বত্থের ডাল। বাতাসে যখন দুলছে মনে হচ্ছে মা যেন তাঁর ভক্ত সন্তানকে চামর ব্যজন করছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছের আলো অন্ধকারে পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ভৃত্য। এমন দৃশ্য মহারাজ কখনও দেখেননি। এক মহাসাধক সম্পূর্ণ সমাহিত আর তাঁর কণ্ঠ হতে অনায়াসে অনন্তে ভেসে যাচ্ছে অপূর্ব সব সঙ্গীত। রামপ্রসাদ তখন গাইছেন—'মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া/ও মন ভাবশক্তি পাবে মুক্তি বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া।'

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অপেক্ষা করে রইলেন কখন ভাঙে সাধকের ধ্যান। তিনি

কথা বলবেন, তিনি পরিচয় করবেন। দীর্ঘক্ষণ পরে [illegible], মহারাজ তখন তাঁর সামনে এগিয়ে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়ালেন।

অপরিচিত সম্ভ্রান্ত এক ব্যক্তিকে সামনে দেখে রামপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন— 'মহাশয় আপনি কে? এখানে কেন? আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?'

মহারাজ বললেন—'আমি আপনার অপূর্ব সঙ্গীতের পথ ধরে এখানে এসেছি। আমি আপনার সঙ্গে কালীতত্ত্ব বিষয়ে কিছু আলাপ আলোচনা করতে চাই।'

রামপ্রসাদ বললেন—'সে তো খুব ভালো কথা! চলুন চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসি।' দুজন চণ্ডীমণ্ডপে এসে বসলেন। ওপাশে চাঁদের আলোয় প্রবাহিত গঙ্গা। অপূর্ব শীতল বাতাস। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মহিমা। চারপাশে গাছপালায় পাতা যেন রুপোর তবক। কোথাও কোনও গাছ ফুটেছে হাসনুহানা, তারই গন্ধে রাত সুবাসিত।

বহুক্ষণ ধরে কালীতত্ত্ব ও শক্তিসাধনা সম্পর্কে নানা কথা হল দুজনে। উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে রামপ্রসাদ গাইতে লাগলেন গানের পর গান! রাত যখন গভীর তখন মহারাজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিলেন। নিজের পরিচয় একবারও দিলেন না। পরদিন সকালে একজন এসে রামপ্রসাদের হাতে একখানি চিঠি দিলেন। তিনি তখন বসে আছেন মায়ের মন্দিরে পূজার আসনে। তিনি চিঠিখানি পড়লেন, তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। চিঠিখানি আসনের বাইরে একপাশে রেখে রাজ-ভৃত্যকে বললেন—'ঠিক আছে তুমি যাও।'

মা ছাড়া তো রামপ্রসাদের কেউ নেই। তিনি মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললেন—'মা এ কী প্রলোভন! তুমি কি জান, কাল রাতে কৃষ্ণনগরের মহারাজা এখানে এসেছিলেন। তিনি আমাকে মাসিক বৃত্তি দিতে চান। আমাকে তাঁর নবরত্ন সভার সভাকবি করতে চান। শুধু তাই নয় মা, তিনি আমাকে নিষ্কর জমিও দান করেছেন। মা, এ দান যে আমি গ্রহণ করতে পারব না। তোমাকে ছেড়ে সংসারের ঐশ্বর্য!' রামপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করে গাইতে লাগলেন—

> কাজ কি মা সামান্য ধনে।
> ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে।।
> সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
> যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে।।

তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বলে পাঠালেন—'আপনি মহানুভব, কাল রাতে আপনার পরিচয় আমি জানতে পারিনি। এমন আগমন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। আপনি আমার শ্রদ্ধাগ্রহণ করুন। আমার বিনীত বক্তব্য, আমি রাজসভায় বসার অযোগ্য। আমার স্বভাবের বিরোধী। আপনার উদারতা গ্রহণে আমি অসমর্থ বলে মার্জনা চাইছি।'

মহারাজা সাধকের নির্লোভ মনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। বুঝলেন ইনি একজন প্রকৃতই সাধক। তিনি তখন প্রায় জোর করেই রামপ্রসাদের সেবায় একশ বিঘে নিষ্কর জমি প্রদান করলেন। এই জমি মেদিনীপুরে, আরও পনেরো বিঘে জমি দিলেন তেঁতুলিয়ায়। তিনি অনুরোধ করলেন—ভক্তের এই সামান্য দক্ষিণার প্রতি আপনি দাক্ষিণ্য দেখাতে অপারগ হবেন না।

সাধক রামপ্রসাদ মায়ের নামে মায়ের সেবায় সেবার এই দান গ্রহণ করেছিলেন। কারণ এই বিদগ্ধ মহারাজকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতী
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ায়।
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতী ॥

একদিন এক রমণী রামপ্রসাদের বাড়িতে এসে বললেন—বাবা, আমি অনেক দূর থেকে তোমার গান শুনতে এসেছি। সামান্য বেশভূষার একজন অতি সাধারণ স্ত্রীলোক। রামপ্রসাদ তখন গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—'মা তুমি বসো আমি চট করে স্নান সেরে আসি।' ফিরে এসে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে লেখা রয়েছে—'বাবা, আমি কাশীর অন্নপূর্ণা, তোমার গান শুনতে এসেছিলুম। তোমার কথামতো অপেক্ষা করতে না পেরে আমি আবার কাশী ফিরে গেলুম। এইবার তুমি আমার এখানে এসে গান শোনাবে।'

লেখা পড়ে রামপ্রসাদ উদ্‌ভ্রান্তের মতো তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন এখুনিই আমাকে কাশী যেতে হবে। জলপথে সে পথ বড় দুষ্কর। পথে চোর ডাকাত দস্যু তস্করের উপদ্রব। নদীর বিচিত্র গতি, ঝড়ঝঞ্ঝা। তবু তিনি চেপে বসলেন নৌকায়। হালিশহরের ঘাট থেকে যাত্রা শুরু হল।

এইবার দুটি মত আছে—এক মতে রামপ্রসাদ কাশী গিয়েছিলেন। আর এক লোককাহিনীর মতে তিনি ত্রিবেণী পর্যন্ত গিয়ে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন—'তোমাকে কাশী যেতে হবে না। তুমি তোমার পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে আমাকে গান শুনিয়ো আমি শুনতে পাব।'

রামপ্রসাদ লিখলেন—

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া-গঙ্গা বারানসী ॥
হৃদ কমলে দ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশিরাশি ॥

গানটি গাইতে গাইতে রামপ্রসাদ ফিরে এলেন হালিশহরের ঘাটে।

রামপ্রসাদের গান শুনেছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। রামপ্রসাদ প্রতি-

দিনকার মতো সেদিনও গঙ্গায় স্নান করছিলেন। আকণ্ঠ জলমগ্ন। আর তিনি উদাত্ত স্বরে একের পর এক গান গাইছেন। একটি বজরা চলেছে ধীরগতিতে। সেই বজরায় রয়েছেন বাংলার নবাব সপার্ষদ। নবাব জিজ্ঞেস করলেন—'কার গান, কে গাইছে!'

পার্ষদদের একজন বললেন—'বলতে পারব না জাঁহাপনা। তবে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।'

তিনি বজরার বাইরে এসে দেখলেন গৌরবর্ণ এক অপূর্ব সুন্দর পুরুষ গঙ্গার জলে অবগাহনরত অবস্থায় গান গাইছেন। নবাবকে বললেন—'এক হিন্দু গান গাইছেন।'

নবাব সঙ্গে সঙ্গে হুকুমজারি করলেন—'বজরা তীরে ভেড়াও।' ঘাটে ভিড়ল। নবাব বজরার ভেতর বসে অনেকক্ষণ গান শুনলেন। তারপর নিজে বেরিয়ে এসে রামপ্রসাদকে অনুরোধ জানালেন—তিনি যদি অনুগ্রহ করে তাঁর বজরায় এসে তাঁকে গান শোনান।

রামপ্রসাদ অনুরোধ রাখলেন। প্রথমে গাইলেন একটি হিন্দি ধ্রুপদ। নবাব শুনে বললেন—'ওসব হিন্দি উর্দু নয়, আপনি জলে দাঁড়িয়ে যে গান গাইছিলেন সেই গান করুন!'

রামপ্রসাদ নবাবকে একের পর এক শ্যামাসঙ্গীত শোনালেন। নবাবেরও দুচোখে জলের ধারা। তিনি রামপ্রসাদকে অনুরোধ করলেন—'আপনি আমার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ চলুন।'

রামপ্রসাদ বিনীতভাবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

চিৎপুর আর কালীঘাট এই দুটি জায়গা তখন অতি ভয়ংকর। গভীর অরণ্য ও হোগলার বন। কালীঘাটে মা কালী চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী। এই চিত্রেশ্বরী সম্পর্কে প্রাচীন কাহিনী হল, চিত্রেশ্বর নামে এক দস্যু দলপতি এই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাকে সবাই চিতে ডাকাত বলে ডাকত। চিত্রেশ্বরীকে পুজো করে চিতের দল বেরোত ডাকাতি করতে। তখন মন্দিরটি ছিল একেবারে গঙ্গার ধারে। এখন গঙ্গা অনেকটা সরে গেছে। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদরি ডবলিউ ওয়ার্ড লিখছেন ১৭৮৮ সালের ঘটনা— a decapitated body was found, which in the opinion of the spectators, had been evidenty offered on the preceding night to this goddess. অর্থাৎ সেই সময়ে চিৎপুরের চিত্রেশ্বরীতে আর কালীঘাটে নরবলি হত। একদিন রামপ্রসাদ নৌকাযোগে হালিশহর থেকে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় তাঁর ভগ্নীপতির বাড়িতে আসছেন গান গাইতে গাইতে। তিনি যখন চিত্রেশ্বরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন তখন যে গানটি গাইছিলেন—মা তারিণী শঙ্কর বৈরাগী তোর নাং। মা চিত্রেশ্বরীর মুখ দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে ঘুরে

গেল। রামপ্রসাদ দেখে হতবাক। ভাবলেন নাং শব্দটি শুনে মা বোধহয় তিরস্কার করছেন। তিনি ভীষণ লজ্জা পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গানের লাইনটি পালটে ফেললেন। তিনি গাইতে লাগলেন—মা তারিণী গো, শঙ্করী ভবানী তোমার নাম। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হল—'প্রসাদ এ গান নয় প্রথম গানটাই গাও।'

এই ঘটনার উল্লেখ গিরিশচন্দ্রও করেছেন। তিনি লিখছেন—ভাবের প্রবাহে মহানবমী সঙ্গীতে গীতের এক চরণ সিদ্ধকবির কণ্ঠ হইতে বাহির হয়। পরে ভয় আসিল ভবানী সম্বন্ধে এমন কথা বাহির হইয়াছে। পদ পরিবর্তিত করিয়া গীত হইল—মা তারিণী গো শঙ্করী ভবানী তোমার নাং। ভাবের পদ ছিল মা তারিণী গো শঙ্কর ভিখারী তোমার নাং। শোনা যায় পদ পরিবর্তনে দৈববাণী হইয়াছিল—'রামপ্রসাদ আগে যাহা গাহিয়া ছিলি তাহাই গা।'

॥ ৪ ॥

আর এক মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-সহোদর ছিলেন শ্রীরামপ্রসাদ। দক্ষিণেশ্বরে সেই মহা অভিমান ভরা উক্তি—মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখা দিবি না। তিনিও ছিলেন তান্ত্রিক। চৌষট্টি তন্ত্রের সাধনে সিদ্ধ এক মহাপুরুষ। দুজনে তন্ত্রের পথ ধরে ভক্তির সাম্রাজ্যে মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনিও মাকে গান শোনাতেন। তিনিও বলতেন, আমি কিছুই জানি না। আমি খাইদাই আর থাকি। আর সব জানেন আমার মা। তিনিও ছুটে ছুটে মায়ের কাছে চলে যেতেন। গল্প করতেন, ঝগড়া করতেন। মান অভিমান হত আবার খেলাও করতেন। তিনি ফুল তুলতেন, বালিকার রূপ ধরে মা জগদম্বাও তাঁর সঙ্গে ফুল তুলতেন, রাসমণির ওই বাগানে। তিনিও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন জমিদারের অনুগ্রহ। ভক্তিসাধনার এ যেন একই পরিণতি শতাব্দীর এপারে আর ওপারে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপলব্ধি এবং তাঁর উপদেশ সহজ করার জন্যে রামপ্রসাদের সঙ্গীত প্রয়োগ করতেন। দুজনেই ধর্মের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। দুজনেরই এক উপলব্ধি—'এ সংসার ধোঁকার টাটি/ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।' দুজনেরই এক নির্দেশ—'ডুব দে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।'

দুজনেই বললেন, সব ধর্মই এক। রামপ্রসাদ বলছেন—মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি/যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।।/আমি বেদাগম-পুরাণে করিলাম/কত খোঁজ তল্লাসি/এ যে কালী কৃষ্ণ শিবরাম/সকল আমার এলোকেশী। দুই সাধকেরই এক নির্দেশ—'রিপু ছয় কর জয়।' 'মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা।' 'ইন্দ্রিয় অবশ যার দেবতা কি বশ তার।' তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে কোনও লাভ নেই, 'যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' সার কথা, 'মা আমার অন্তরে আছ/তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা।'

রামপ্রসাদ বলছেন—'বেদ বাক্য নিরাকার ভজনে কেবল্য/সে কথা না ভালো শুনি বুদ্ধির তারল্য/প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়/যেমন রুচি তেমনই কর নির্বাণ কে চায়।'

মা এসে রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়ে গেলেন। আর গঙ্গার জলে পাঠিয়ে দিলেন বেড়া বাঁধার উপকরণ শ্রীরামকৃষ্ণকে। ভক্তের জন্যে মায়ের বড় দায়। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যে লাল জবা গাছে সাদা ফুল ফোটাতে হল প্রকৃতির নিয়ম তুচ্ছ করে! আর!—রামপ্রসাদ একদিন পূজায় বসেছেন। হাতের কাছে যত রকমের ফুল ছিল সব সাজিয়েছেন। ধূপ জ্বেলেছেন, হোম সাঙ্গ হয়েছে। হঠাৎ তাঁর মনে হল, পদ্ম চাই, পদ্ম। মাকে আজ পদ্মফুলে পূজা করব। একশ আট পদ্ম সাজিয়ে দেব মায়ের চরণতলে। কিন্তু কোথায় পদ্ম! প্রসাদ শিশুর মতো কাঁদছেন—মা তুই সত্য, তুই সর্ব নিয়ন্তা, তোর ভেতরেই না জগৎ বিধৃত, আমার বাসনা পূর্ণ করে দে মা। রাঙা চরণে রাঙা জবা দিয়েছি এখন যে রাঙা পদ্ম দেবার সাধ হয়েছে মা! বলছেন আর কাঁদছেন, এমন সময় শুনলেন তার ভেতরে মায়ের কণ্ঠস্বর—'প্রসাদ, তুমি একটা কাজ করো, ওই যে বাড়ির বাইরে এক কোণে, ওই যে ছোট গাছটি। ওই গাছ থেকে পদ্মফুল নিয়ে এসো।' প্রসাদ মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলেন, কোথায় সরোবর? কোথায় পদ্ম? এটা তো একটা গাব গাছ! গাব গাছে পদ্ম ফুল? কিন্তু মায়ের নির্দেশে প্রসাদ গাব গাছে উঠে পড়লেন। উঠে দেখছেন গাছের মাথায় শত শত পদ্মফুল ফুটে উঠছে। আনন্দে অধীর সাধক সাজি ভরে ফুল তুলে নেমে এলেন নিচে। মায়ের পা ঢেকে দিলেন অজস্র পদ্মে।

বড় দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে সাধক রামপ্রসাদের সময় বহেছে। বাংলার সে বড় দুর্যোগের সময়। মীর্জা গালিবও আর এক প্রান্তে এমনই দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে জীবন তরণী বেয়েছিলেন। রামপ্রসাদের যুগ ছিল যুগসন্ধির যুগ। নবাবী আমল শেষ হচ্ছে, কোম্পানি ঢুকছে, রাষ্ট্রবিপ্লব, অন্তর্বিদ্রোহ, অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন। সমাজের নিম্নশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর নানা দিক থেকে আঘাতের পর আঘাত। দস্যু, চোর, ডাকাত, ঠগি, বর্গি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ। রামপ্রসাদ গান গাইছেন পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে।

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।

ভবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই।

পূজার বাহ্যাড়ম্বর তিনি পছন্দ করতেন না—ঝাড়লণ্ঠন বাতির আলো/কাজ কিরে তোর সে রোশনায়ে/তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে দেওনা/জ্বলুক নিশি দিনে।। মনের জমি কর্ষণ করো তাতে ভক্তিবারি ঢাল আর গুরুদত্ত বীজ বুনে দাও, আর কালী নামের বেড়া দিয়ে বসে থাক। 'কালী যার হৃদে জাগে/তর্ক তার কোথা লাগে/কেবল বাদার্থ মাত্র ঘট পটরে।'

।। ৫ ।।

১৭৭৫ সাল। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত। রামপ্রসাদ মায়ের সামনে পূজার আসনে। এমন পূজা কেউ কি কখনও দেখেছে? জ্যোতির্ময়ী মায়ের সামনে জ্যোতির্ময় সাধক। গ্রামবাসীরা পূজামণ্ডপে সমবেত। এমন পূজা তারা কখনও দেখেনি। ভক্তির এমন জোয়ার! গানের পর গান, পূজার সমস্ত প্রথা পালিত হল। সংস্কৃতজ্ঞ সিদ্ধ তান্ত্রিকের কণ্ঠে উচ্চারিত শাক্তমন্ত্রে রাত ঝঙ্কৃত হল, জ্বলে উঠল হোমের শিখা। অঞ্জলি দেওয়া হল মায়ের চরণে। মায়ের পদতলে ফুলের সমারোহ, ধূপের গন্ধ, ধুনোর ধোঁয়া। পূজা শেষ করে রামপ্রসাদ সকলকে আহ্বান করে জানালেন—'এই আমার শেষ পূজা।' বলেই একটি গান গাইলেন—'মুক্ত করো মা মুক্তকেশী/ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।'

রাত তখনও ভোর হয়নি। অন্ধকার তখনও লেগে আছে, কারও ওঠার ক্ষমতা নেই। একের পর এক গান গেয়ে চলেছেন রামপ্রসাদ—'সামাল ভবে ডুবে তরী/তরী ডুবে যায় জনমের মতো।' আসনে বসে শেষ গানটি গাইলেন—'রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হল/এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চল।' আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন ভোর। সমস্ত গুরুজনদের একে একে প্রণাম করলেন, সমবয়স্কদের আলিঙ্গন করলেন। গ্রামবাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—'এইবার আমি আসি ভাই।' সকলের চোখে জল, সাধকের এ কী সিদ্ধান্ত! ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হালিশহর, যার আর এক নাম কুমারহট্ট। শক্তিসাধনার পীঠস্থান। যেখানে শাক্ত আর বৈষ্ণবরা বহুবার মুখোমুখি হয়েছেন তর্ক যুদ্ধে। কুমারহট্ট নামটি এসেছে যে ঐতিহাসিক ঘটনায় সেটি বড় অদ্ভুত। একটি হল মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য গঙ্গাস্নানের জন্যে বহুলোকজন নিয়ে এই গ্রামে প্রায় প্রতি বৎসরই আসতেন। সেই সময় মহাসমারোহ হত, হাট বসত, সেই হাট এক সময়ে স্থায়ী হয়ে গেল, জায়গাটির নাম হল কুমারহট্ট। দ্বিতীয় কাহিনী, নবদ্বীপের পণ্ডিতরা এসেছেন, বিচার যুদ্ধ হবে। হালিশহরের পণ্ডিতরা বিচারের বদলে তাঁদের কৌশলে পরাস্ত করার ব্যবস্থা নিলেন। পণ্ডিতদের মহাসমাদরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হল। সেবার জন্যে একজন পরিচারিকা নিযুক্ত হলেন। সেই পরিচারিকার সঙ্গে একটি বালকও রয়েছে। ভোর হল। চতুর্দিকে কাকের কর্কশ চিৎকার—কা কা। ওই রমণী তাঁর ছেলেকে বললেন—পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করে আয় তো, কাকগুলো কেন কা কা করছে? পণ্ডিতরা বললেন—কাক জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্মই হল কা কা করা। উত্তর শুনে বালকটি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে মায়ের কাছে এসে বললে—'মা তুই বল।' মা তখন পণ্ডিতরা যাতে শুনতে পায় এইরকম উঁচু গলায়

বললেন—'শোন, "তিমিরারিস্তমো হন্তি শঙ্কাকুলিত্মানসাঃ।
বয়ং কাকা বয়ং কাকা ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ।।"

কাকরা ভয়ে কা কা করছে, ওরে সূর্যদেব অন্ধকার বিনষ্ট করে চারিদিক আলো করে দিচ্ছেন। আমাদের গায়ের রঙও তো কালো, সব কালো যদি আলো হয়ে যায় তাহলে আমরাও তো মরলাম। আয় আমরা সবাই মিলে চিৎকার করে বলি, আমরা অন্ধকার নই আমরা কালো কাক—আমরা কাক, আমরা কাক।'

পণ্ডিতমশাইরা সেই মহিলাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—'তুমি এই শ্লোক কোথায় শিখলে?' পরিচারিকা বললেন—'কোথায় আর শিখব বাবাঠাকুর, বাড়ির পাশে টোল, পণ্ডিতরা ছাত্রদের পড়ান, শুনে শুনে শিখেছি।'

পণ্ডিতরা ভয়ে হালিশহর ছেড়ে চলে গেলেন। যেখানে সামান্য এক নীচ জাতির রমণীর এই পাণ্ডিত্য, সেখানকার পণ্ডিতরা না জানি কেমন! কুম্ভকার জাতির সেই রমণীর বুদ্ধির প্রশংসায় স্থানটির নাম রাখা হল কুমারহট্ট।

সেই ঐতিহাসিক কুমারহট্টে এসেছিলেন মহাসাধক রামপ্রসাদ। একটা সময়কে তিনি মাতিয়ে রেখেছিলেন তাঁর সাধনায়, তাঁর কবিত্বে, তাঁর গানে। তিনি স্বেচ্ছায় বিদায় নিচ্ছেন। এ কী অসহ্য কথা!

শোভাযাত্রা তৈরি হল। বিদায়ের বাদ্যবাজনা বাজছে। রামপ্রসাদ তাঁর সাধন-পীঠ পঞ্চমুণ্ডির আসনের কাছে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। প্রদক্ষিণ করলেন চণ্ডীমণ্ডপ, প্রতিটি বৃক্ষকে আলিঙ্গন করলেন। অপরাজিতা ও মাধবীলতা ঘেরা পঞ্চবটীকে হাসি হাসি মুখে বললেন—'ভালো থেকো'। পরিবার পরিজনদের দিকে এক ঝলক তাকালেন। মাথার ওপর আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলেন, তারপর মাথায় তুলে নিলেন মায়ের প্রতিমা।

ওই চলেছেন রামপ্রসাদ, মাথায় তাঁর আরাধ্যা দেবীর প্রতিমা। সদানন্দময় সাধক চলেছেন তাঁর প্রিয় নদী গঙ্গার দিকে। পেছনে পেছনে আসছে শোভাযাত্রা, মন্দিরে মন্দিরে তখন আরতির ঘণ্টাধ্বনি। পায়ের নিচে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি হালিশহরের মাটি।

গঙ্গার তীরে মায়ের মূর্তি নামালেন ভক্ত রামপ্রসাদের শিরোদেশ থেকে। রামপ্রসাদ নিজে নেমে গেলেন নাভি পর্যন্ত জলে। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর আরও গভীর জলে গেলেন। জলের ওপরে তাঁর কাঁধ আর মাথাটুকু জেগে রইল। সেই জলে দাঁড়িয়ে তিনি পরপর চারটি গান গাইলেন। প্রথম গান, 'কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে/এ তনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।' দ্বিতীয় গান, 'বল্ দেখি ভাই কী হয় মোলে!' তৃতীয় গান, 'নিতান্ত যাবে দিন, কেবল ঘোষণা রবে গো।' চতুর্থ গান, 'তারা তোমার আর কী মনে আছে।' শেষ গান—'মাগো ওমা, আমার দফা হল রফা, দক্ষিণা হয়েছে' বার বার বলতে লাগলেন দক্ষিণা

হয়েছে, দক্ষিণা হয়েছে। যতবার বলছেন ততই কণ্ঠস্বর করুণ থেকে করুণতর, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, শেষে আর নাই। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে তাঁর প্রাণ মিশে গেল অনন্তে। গঙ্গার পাড়ে মায়ের প্রতিমা। এক হাতে বরাভয় আর এক হাতে অসি। মুখে ভুবনমোহিনী হাসি, গলায় দুলছে ভক্তের হাতে পরিয়ে দেওয়া জবার মালা। সামনে প্রবাহিত গঙ্গা, আকাশে নতুন দিনের সূর্য, সারি সারি স্তব্ধ মানুষ। কেউ নেই কিছু নেই। দেহ অদৃশ্য হয়েছে গঙ্গার জলে।

আজও নৌকো ভেসে যায়, আজও পুণ্যার্থীরা স্নানে আসেন। হালিশহর আজ তীর্থ। সবাই ছুটে যান সেই মহাসাধকের ভিটেতে। আজও বহু কণ্ঠে রামপ্রসাদের গান :

মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রৈলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।।
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
(মন রে আমার)
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না।।

তিনি আজ নেই। সেই না-থাকাটাই যেন আরও বিশাল, অবিনাশী এক তরঙ্গ।

www.boiRboi.blogspot.com

B 2004

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের আমলে যে ভাবে কালীপুজো হত, এখনও কি সেভাবেই হয়?

'রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য' এই মন্ত্রে পূজারী চতুর্দিকে জল ছড়ালেন। আসনে যে পূজারী বসে আছেন তিনি সামান্য নন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। অঙ্গন্যাস করন্যাস পূজার সমস্ত অঙ্গ তিনি একে একে সম্পন্ন করছেন। সাধারণের থেকে তফাত এই—শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন তাঁর সর্ব অঙ্গে সমস্ত মন্ত্রবর্ণ যথাযথা স্থানে উজ্জ্বল অগ্নিরেখায় ফুটে উঠছে। দেখছেন সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না পথে ধীরে ধীরে সহস্রারের দিকে উঠছে। আর ওই শক্তি যে যে অংশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে শরীরের সেইসব অংশ হয়ে যাচ্ছে নিস্পন্দ, অসাড়, মৃতবৎ। একে একে মূলাধার গেল, গেল স্বাধিষ্ঠান, গেল মণিপুর। শুধু ফুটে উঠল সহস্রারের শতদল। রং এই মন্ত্রে গর্ভমন্দির থরথর করে কেঁপে উঠল। পূজারীকে বেষ্টন করে জ্বলে উঠল শত জিহ্বা বিস্তার করে অগ্নিপ্রাকার। সামনে বেদীতে মা ভবতারিণী যেন খিলখিল করে হাসছেন।

ঠাকুরের একান্ত অনুরাগী ভাগিনেয় হৃদয় আড়াল থেকে দেখছেন মাতুলের পূজা। মন্দিরের আরও অনেকে আছেন। তাঁদের গা ছমছম করছে, ভয় করছে। আসনে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে তখন আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর সমস্ত শরীর থেকে অদ্ভুত একটা তাপ, অদ্ভুত একটা জ্যোতিঃ বেরোচ্ছে!

হৃদয় পরে ভক্তদের বলেছিলেন—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর পরিগ্রহ করে পূজা করতে বসেছেন। ঠাকুরের পূজা একটা দেখবার বিষয় ছিল। যে দেখত সে-ই বাক্যহারা হয়ে যেত। পূজার আগে তিনি মা-কে গান শোনাতেন। সেখানে কালোয়াতি থাকত না। থাকত না কোনও ঢং ঢাং। গানের বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ ঢুকে যেতেন। গানের ভেতরে বসে তিনি গান গাইতেন। যেমন অপূর্ব কণ্ঠস্বর সেই রকম তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। তিনি মাকে গান শোনাতেন মানুষকে নয়। তাই তাঁর 'সুরগুলি চরণ পেত' আর সেই চরণ ছুঁয়ে শ্রোতাদের কানে ফিরে আসত। হয়ে যেত সাপুড়িয়ার সাপ খেলানো বাঁশি।

রানী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসতেন তখন ঠাকুরকে অনুরোধ করতেন—'বাবা গান শোনাও'। রানীর যে গানটি সবচেয়ে প্রিয় ছিল সেই গানটি হল—

কোন হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব্ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে।।

জেনেছি জেনেছি তারা,
তারা কি তোর এমনি ধারা।
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অমনি করে।

গায়কও অঝোরে কাঁদছেন শ্রোতাও অঝোরে কাঁদছেন।

ঠাকুরের পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল সঙ্গীত। সেইসব সঙ্গীতের রচয়িতারা ছিলেন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ। এঁরা সকলেই ছিলেন মহা মহা কালীসাধক, তাঁদের গীত ছিল মায়ের সঙ্গে ভাবের কথা। হৃদয় বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন পূজা করতেন তখন এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে আশেপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলাবলি করলেও তিনি শুনতে পেতেন না। তিনি তখন অন্য জগতে।

ঠাকুরের দাদা রামকুমার কামারপুকুর থেকে ভাইকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। তাঁরা দুজনে প্রথমে এলেন নাথের বাগানে। এই নাথের বাগানের অবস্থান, কলকাতার শোভাবাজারে। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন সতেরো। দু ভাই কলকাতায় এসেছেন ভাগ্যের সন্ধানে। ইংরেজের কলকাতায় বড়লোকদের মহাদাপট। রাজা মহারাজারা চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে ঘুরছেন। ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ খুলে সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চায় উদ্যোগী হয়েছেন। এদিকে ওদিকে টোল খোলা হচ্ছে। সংস্কৃত পণ্ডিতদের বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। কামারপুকুরের সংসার বড় হচ্ছে। দাদা রামকুমার উপার্জনের আশায় গ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে। নাথের বাগানে কিছুদিন থাকার পর রামকুমার এলেন ঝামাপুকুরে। ঠিকানা, ৬১ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট। বাড়ির মালিক গোবিন্দ চাটুজ্যে। একতলা বাড়ি, পুরনো বাড়ি। এখানে রাস্তার ওপর রাধাকৃষ্ণের মন্দির। সেই মন্দির আজও আছে। তখন এই মন্দিরের বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দবাবুর বাড়ি থেকে পূজা পেতেন। অদূরেই ১ নং ঝামাপুকুর লেন। সেই প্রাসাদটি হল রাজা দিগম্বর মিত্রের রাজবাড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণকে আনার প্রায় চার বছর আগেই রামকুমার কলকাতায় তাঁর ভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। রাজবাড়ির কাছেই একটি টোল খুলেছিলেন। তিনি জ্যোতিষ আর স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ছাত্রদের পড়াতেন। রাজবাড়ি ও অন্য কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে নিত্য দেব-সেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এত কাজ একা সামলাতে পারছিলেন না রামকুমার। ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ, তখন তিনি গদাধর, দাদাকে সাহায্য করার জন্যে এলেন। শক্তিপূজা না জানলেও অন্য পূজায় পারদর্শী। পূজা তিনি ভালোবাসেন। কামারপুকুরে গৃহদেবতা রঘুবীরের নিত্যপূজা তিনিই করতেন। নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, নরম, কোমল, প্রেমিক দেব-দেবীর পূজা গদাধর ভালোই পারেন। বিধি আর ভাবের মিলনে সে-পূজা অতি অসাধারণ। রামকুমার তাঁর দায়িত্ব দু-ভাগ করে নিলেন। নিজেকে রাখলেন টোলে অধ্যাপনার

কাজে, আর যজমানির দায়িত্ব দিলেন ভ্রাতা গদাধরকে। বিদায়-আদায়ের সুবিধার জন্যে রামকুমার ছাতুবাবুর দলভুক্ত হয়েছিলেন।

সেইসময় কলকাতার সমাজজীবনে খুব দলাদলি ছিল। বড়লোকদের অঢেল পয়সা, অলস জীবন। করার কিছু নেই তো দলাদলি করো। সিমুলিয়া ও তার সন্নিহিত এলাকার লোকেরা ছিলেন ছাতুবাবুর দলভুক্ত, আর বাগবাজার এলাকার লোকেরা ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেবের দলে। একদিন সভা করে এই দুই এলাকার কুলীন ও মাননীয় মানুষরা রাজা রাধাকান্ত ও ছাতুবাবুকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করে গোষ্ঠীপতির স্বীকৃতি দিলেন। উত্তর কলকাতার দুই মাথা—রাজা রাধাকান্ত দেব আর ছাতুবাবু। রামদুলাল সরকার ছিলেন এক অসাধারণ মানুষ। ভিখারি থেকে কোটিপতি। দাতা, দরিদ্রবান্ধব। তাঁর দুই ছেলে। আশুতোষ ও প্রমথনাথ। ডাকনাম, সাতুবাবু ও লাটুবাবু। সাতুবাবু থেকে ছাতুবাবু। ঝামাপুকুর ছাতুবাবুর এলাকা। রামকুমার তাঁর দলভুক্ত হয়েছিলেন।

দৈব যদি মানতে হয়, তাহলে বলতে হয় রামকুমার এবং রানী রাসমণির যোগাযোগ। রাসমণি নৌবহর নিয়ে যাবেন কাশী। প্রত্যাদেশ হল, 'রানী! কাশী নয় কালী'। সেই কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও অন্নভোগ-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে ঝামাপুকুর টোলের সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ রামকুমার হলেন পূজারী।

এই যোগাযোগ না হলে কি হত! ঝামাপুকুর টোল তিন-চার বছরেও তেমন প্রতিষ্ঠা পায়নি। যে-আশায় রামকুমার কলকাতায় এসেছিলেন সে-আশা পূর্ণ হল না। পরিশ্রমই সার হল আয়ের মুখ দেখলেন না। তারপর হঠাৎ এই পরিবর্তন। জানবাজারে রামকুমারের প্রতিষ্ঠা। রামকুমারের সমাধান না এলে মাকে প্যাকিং বাক্স থেকে বের করা যেত কি? বহুমূল্য মন্দির, ষাট বিঘা জমির ওপর উদ্যান, পোস্তা, রুপোর সিংহাসন, দ্বাদশ শিবমন্দির, চাঁদনি, পঞ্চবটী, সবই হয়ে যেত ব্যর্থ প্রয়াস। ব্রাহ্মণদের বিচিত্র বিধান। মা কালীকে অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার মাহিষ্যের নেই। উচ্চবর্ণের মানুষ তোমার মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করবে না। মা কালীরও জাত আছে। মাহিষ্য কিন্তু ক্ষত্রিয়। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উত্তর পুরুষ।

এই যোগাযোগ না হলে কালী কোনও কালেই আমাদের মা হতেন না। শ্মশান কালী, ডাকাত কালীই হয়ে থাকতেন। চারপাশে মনুষ্যরূপী ভূত-প্রেতের নৃত্য। শ্যামা কালী, দক্ষিণা কালী হয়ে আমাদের ঘরে ঘরে করুণা বিতরণ করতেন না। রহস্যময়ীর রহস্য উন্মোচন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া সকলেই ছিলেন মহাসাধক। মা কালীকে মাতৃজ্ঞানে উপাসনা করেছেন। সিদ্ধিলাভ করেছেন, বিভোর হয়েছেন, পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলার কারণ? তাঁর নিজের সংজ্ঞা! এমনটি কারও বলার ক্ষমতা ছিল কি? অবতার হল

বাহাদুরী কাঠ। নিজে ভাসে, তার ওপর চড়ে দশজন ভাসতে ভাসতে সাগর পেরোতে পারে। শক্তির সঙ্গে ভক্তিকে এমনভাবে কেউ মেলাতে পারেননি। ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তির মিলন। নিরাকার-সাকার দ্বন্দ্বের চির অবসান। সেই কারণেই কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বারে বারে শুনতে চাইতেন মা কালীর ব্যাখ্যা। টয়েনবি ঐতিহাসিক। তিনি বললেন, ইতিপূর্বে কেউ কখনও কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতা অতিক্রম করতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা থেকে প্রকাশিত হল নবযুগ ধর্ম।

কেমন ছিল কলকাতার ঘরোয়া কালীপূজা, সে-কালের কলকাতায়? কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়িতে যাওয়া যাক। ঠিকানা সুবা বাজার বা শোভাবাজার। কালীপূজা হয়, পূজার রাতে। ঘোর তান্ত্রিক। ভীষণ তান্ত্রিক। এঁদের আহ্নিক মানেই আকণ্ঠ সুরাপান। শ্যামাপূজার রাতে গুরু, পুরোহিত, কর্তা, অন্দরের গৃহিণী, সমস্ত মহিলা এমন কি দাসদাসীদেরও সুরা পান করতে হত। কড়া নিয়ম। সকাল থেকেই মদ্যপান। কালী পূজা যে।

ঢুলিরা সকাল থেকেই ঢাক পিটে পাড়া অস্থির করে তুলছে। দুপুরবেলা অন্দরমহলে গিয়ে গৃহিণীকে বলছে, 'মা, হাতে হাতে একটু তেল দিন আমরা নাইতে যাব, আর জলপান।' গৃহিণী মদে চুর। রেগে গিয়ে বলছেন, 'কি! তোরা আমার বাড়িতে তেল, জলপান চাচ্ছিস? মেঠাই খা, মোমবাতি মাখ।'

পূজার দালানে সাত হাত লম্বা প্রতিমা। পর্বতপ্রমাণ মিষ্টান্নের স্তূপ। একের পর এক বলি হয়েই চলেছে। কান ফাটানো ঢাকের আওয়াজ। পশুদের আর্ত চিৎকার। অসুরের মতো কয়েকটা লোক খাঁড়া হাতে নাচছে। পশুর রক্তে বাড়ির প্রাঙ্গণ ডুবে যেত। থইথই করত চারপাশ। নর্দমায় রক্তের স্রোত বইত। একবার কালীপূজার রাতে কর্তার খেয়াল হল, আমি এত পশুকে বলিদান দিয়ে স্বর্গে পাঠাচ্ছি, আমার কত পুণ্য হচ্ছে, আচ্ছা স্বয়ং গুরুদেবকে যদি বলি দিয়ে স্বর্গে পাঠাই, তা হলে তো আরও পুণ্য হবে। গুরুদেব মদে চুর হয়ে আছেন। তাঁকে বলামাত্রই নেচে উঠলেন, 'চলো, চলো, আর দেরি নয়, রাত থাকতে থাকতেই স্বর্গে চলে যাই। মা, আসছি গো!'

গুরুদেবকে হাড়িকাঠের কাছে আনা হল। কর্তা বললেন, 'গুরুদেব গলা লাগান। জয় মা বলে হয়ে যাক।' যাঁরা বলিদান করছিলেন, তাঁরা সবাই কর্মকার। কর্তার আদেশে সকলকেই মদ্যপান করতে হয়েছে, তবে মাত্রা কম। এত বলি দিতে হবে মাতাল হলেই সর্বনাশ। তাঁরা ভাব দেখাচ্ছেন, কতই না খেয়েছি? তা না হলে কর্তা আবার জোর করে গিলিয়ে দেবেন। বলিদানের দলপতির মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি বললেন, 'কর্তামশাই! এখানে যত খাঁড়া আছে, সব খাঁড়াই চিরকাল পশুবলি দিয়ে আসছে, এতে কি গুরুদেবকে বলি দেওয়া যায়?

গুরুদেবের জন্যে চাই নতুন খাঁড়া। আপনি ভাববেন না। একটু [illegible] বাড়িতে নতুন খাঁড়া তৈরি আছে। নিয়ে আসছি। এই যাব আর আসব।'

দলপতি দলের সকলকে সতর্ক থাকতে বলে চলে গেলেন থানায়। পুলিশ এসে গুরুদেবের স্বর্গযাত্রা বন্ধ করলে। তন্ত্রে বলিদানের নির্দেশ আছে। কালিকাপুরাণ বলছেন, 'চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা।' সাধক মোদক দ্বারা গণপতিকে, ঘৃত দ্বারা হরিকে, নিয়মিত গীত বাদ্য দ্বারা শঙ্করকে এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিবে। শাস্ত্রে আট রকমের 'বলি'র কথা বলা হয়েছে। পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোধা, শশক, বায়স, চমর, কৃষ্ণসার, শশ, সিংহ, মৎস্য, স্বগাত্র-রুধির, ঘোড়া, হস্তী। এর পরে আছে মহাবলি। মহাবলি হল শরভ। বিশেষ এক ধরনের বৃহৎ মৃগ, উটও হতে পারে। আর অতি বলি হল মানুষ।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, 'মহাশয়, আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে; বলিদান করা কি ভালো? এতে তো জীবহিংসা করা হয়।'

ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে। 'বিধিবাদীয়' বলিতে দোষ নাই। যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা।' এরপরে নিজের অবস্থার কথা বলছেন, 'আমার এখন এমন অবস্থা, দাঁড়িয়ে বলি দেখতে পারি না। মার প্রসাদী মাংস এ-অবস্থায় খেতে পারি না। তাই আঙুলে করে একটু ছুঁয়ে মাথায় ফোঁটা কাটি; পাছে মা রাগ করেন।'

সংশয়ের উত্তর পুরাণও দিচ্ছেন, 'ব্রহ্মা স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত সকল প্রকার বলির সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করি, এই জন্যে যজ্ঞে পশুবধ হিংসার মধ্যে গণ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলছেন 'বিধিবাদীয়'। একটি ভয়ের কথা বলছেন, প্রসাদী মাংস খেতে পারেন না, তাই আঙুলে করে ছুঁয়ে মাথায় ফোঁটা কাটেন, পাছে মা রাগ করেন। পাথরের মা রাগ করতে পারেন?

অতীত ঘুরে আসি। মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হল মায়ের মন্দির। রামকুমার হলেন প্রথম পূজারী। কয়েক মাসের মধ্যেই মথুরবাবু ধরে ফেললেন তরুণ গদাধরকে। সদাই ভাবে বিভোর। কারও ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসতে চায় না। শুধু দেখে, বাগান, ফুল, গঙ্গা, মন্দির। মথুরবাবু বললেন, তুমি হবে মায়ের বেশকার। তুমি শিল্পী, কবি, ভাবুক। এইটুকুই চেনা গেছে, ধরা গেছে। রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন মায়ের মন্দিরের পূজারী। আর রামকুমার নিলেন রাধা গোবিন্দের অপেক্ষাকৃত সহজ পূজার ভার। গদাধর দাদার কাছে কালীপূজা শিখেছিলেন। 'রামকুমার তাহাকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীকালিকামাতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি শিখাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঐরূপে দশকর্মান্বিত

ব্রাহ্মণগণের যাহা শিক্ষা করা কর্তব্য তাহা অচিরে শিখিয়া লইলেন।' শাক্তী দীক্ষা না নিলে দেবীপূজার অধিকারী হওয়া যায় না। প্রবীণ শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণকে শক্তিমন্ত্রে যথাবিহিত দীক্ষা দিলেন। সাধক ভট্টাচার্য মহাশয় কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে থাকতেন। মথুরবাবু ও রামকুমারের পরিচিত। কালীবাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। সম্মানিত ব্যক্তি। কানে বীজমন্ত্র পড়া মাত্রই গদাধর সমাহিত। গুরু সেই দিনই এই বুঝে গেলেন, তাঁর শিষ্য সাধারণ মানুষ নয়।

গদাধর মায়ের পূজারী হলেন। বিধিসম্মত পূজার আড়াল থেকে প্রকাশিত হতে থাকল অলৌকিক পূজা। চাল-কলা-বাঁধা পুরোহিতরা সে-পূজার মর্ম বুঝবেন না। সে-পূজা বিধি মানে না। ভাবের পথে চলে। পাষাণপ্রতিমা জীবন্ত হয়। বেদী থেকে নেমে এসে সাধকের সঙ্গে খেলা করেন। কথা বলেন। আবদার করেন। গদাধর মায়ের নাকের কাছে তুলো ধরে দেখছেন, শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। মথুরবাবু, রানী রাসমণি বুঝে গেলেন, মায়ের কৃপায় মন্দিরে এক মহাসাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। তন্ত্র-মন্ত্রের অক্ষরমালা ছেড়ে মা বেরিয়ে আসবেন। কালী ভয়ঙ্করী, রহস্যময়ী—এই ভয়, এই ভীতি ভেঙে যাবে। অনন্তের বিস্তৃত অঙ্গনে জীবকে মায়াপাশে বেঁধে জীবন-মৃত্যুর খেলা খেলছেন অনন্ত-রূপিণী কালী। গদাধর গান গাইছেন—'কে জানে মা কালী কেমন/ষড়দর্শনে না পায় দরশন/'গদাধর গাইছেন 'মা ত্বং হি তারা।' কুড়ি থেকে পঞ্চাশ-তিরিশ বছরের একটি জীবন বেরিয়ে এল, যার মধ্যে গোটানো রইল 'তিন কাল'। সর্বকালের 'শব-সাধনা' নয় 'সব-সাধনা'র একটি 'কমপ্যাক্ট-ডিস্ক' তৈরি হল পঞ্চবটীতে এই সাধকের সাধনায়।

মথুরবাবু বললেন—বাবা, আমি যে তোমাকে চিনেছি—তুমিই শিব, তুমিই কালী, আমি তোমার সেবক। বৈধী পূজা তোমাকে আর করতে হবে না। কালীপুজো নয়, কালীসাধো। তোমার সাধনায় লেগে থাকুক আমাদের ছিন্ন চিহ্ন। তুমি স্টিমার আমরা 'গাধা বোট'। মায়ের মন্দিরে পূজারী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই রামতারক। তাঁর আর এক নাম হলধারী। সুপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান সাধক। বিষ্ণুর উপাসক হলেও শক্তিপূজার বিরোধী ছিলেন না। তবে পশুবলির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। একটা নিয়ম ছিল, এই এই দিন মন্দিরে বলি হবে। সেই সব দিনে অতি ক্ষুণ্ণ মনে তিনি মায়ের পূজা করতেন। এইভাবে একটা মাস গেল। তারপর হলধারী একদিন সন্ধ্যা করতে বসেছেন। হঠাৎ দেখছেন, মা ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন—আমার পূজা তোকে করতে হবে না, করলে সেবাপরাধে তোর ছেলের মৃত্যু হবে। হলধারী ভাবলেন, এ তাঁর মাথার খেয়াল। এই দর্শন, এই সাবধানবাণীকে তিনি পাত্তা দিলেন না। পুজো যেমন করছিলেন, সেই রকমই করতে লাগলেন। হঠাৎ দেশ থেকে এল পুত্রের

মৃত্যুসংবাদ। তিনি মায়ের পূজা ছেড়ে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজায় চলে এলেন। বলতে লাগলেন, কালী তামসী, তমোগুণময়ী। শ্রীরামকৃষ্ণকেও সে-কথা বললেন। ঠাকুর খুব দুঃখ পেলেন। ছুটলেন কালীঘরে মায়ের কাছে। মা কালী তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন, খেলা করতেন, মান অভিমান করতেন, আদর আবদার করতেন, শয়ন দেওয়ার সময় বলতেন, 'তুই আমার পাশে শো'।

ঠাকুর মাকে বলছেন, দু-চোখ জলে ভরা, 'মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, সে তোকে তমোগুণময়ী বলে, তুই কি সত্যিই তাই?' মা হাসলেন, বুঝিয়ে দিলেন তাঁর স্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটছেন, কোথায় সেই হলধারী! ওই যে বসে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাঁধে চেপে বসলেন, 'তুই মাকে তামসী বলিস? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী। হলধারী বিষ্ণুঘরে পূজার আসনে বসেছিলেন, তিনি দেখছেন গদাধর নয়, স্বয়ং মা কালী কাঁধে চেপেছেন। তিনি ভাবে বিভোর হয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

১৮৮৪ সাল, ১৮ অক্টোবর, শনিবার। আজ কালীপূজা। রাত আটটা। মাস্টারমশাই মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করছেন। উদ্যানমধ্যে মাঝে মাঝে দীপ—দেবমন্দির আলোকে সুশোভিত। মাঝে মাঝে রোশনচৌকি বাজিতেছে। কর্ম্মচারীরা দ্রুতপদে মন্দিরের এই স্থান হইতে ওই স্থানে যাতায়াত করিতেছেন। গ্রাম হইতে আবাল বৃদ্ধ বণিতা বহু সংখ্যক লোক ঠাকুর দর্শন করিতে সর্বদা আসিতেছে।

বিকেলে নাটমন্দিরে চণ্ডীর গান হল—রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বিভোর। ছোট খাটটিতে বেশ গুছিয়ে বসে আছেন। নহবতে মা রয়েছেন। আলোর মালায় ঘেরা। মানুষের স্রোত বইছে। ঠাকুরের সামনে মেঝেতে বসে আছেন ভক্তমণ্ডলী। সারাটা বিকেল চণ্ডীর গান শুনেছেন, সেই গানের রেশ মাথায় ঘুরছে। আস্তে আস্তে গাইছেন,

কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥

একটু একটু করে আরও গান, আরও আরও গান। দেবালয়ে ব্যস্ত পূজার আয়োজন। মধ্য রাত এগিয়ে আসছে, এদিকে ঠাকুরের ভাব জমছে। প্রেমানন্দে নাচছেন আর গাইছেন কমলাকান্তের গান, মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ-নীলকমলে।

রাত এগারোটা। মহানিশা। মিশকালো আকাশ। কালোর দাপটে তারারাও ক্ষীণ-প্রভ। জোয়ার এসেছে, গঙ্গা তত্তরিয়ে ছুটছে উত্তরমুখো। নিঃশব্দ আলোয় উদ্যান, গঙ্গার ধার, মন্দিরপ্রাঙ্গণ ঝাঁ ঝাঁ করছে। এত আলো, এত মানুষ, তবু কেমন যেন সব থমথমে। তীরের আলো তরতরে গঙ্গায় পড়ে চপলা হয়েছে।

আর কয়েক মিনিট পরেই বারোটা বাজবে। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল

পূজারীর সাজেঘরে এলেন। আজকের পূজারী তিনি। স্মৃতি ভিড় করে আসছে। মথুর নেই। মথুরের সময় আরও বোলবোলা ছিল। আরও আলো, যাত্রা, গান। বড় বড় লুচি, কচুরি, দই, মিষ্টি, পায়েস।

সেবার মনে আছে! মথুর বনহুগলীর এক ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক হওয়ার জন্যে বলেছিলেন। তিনি এলেন রাত এগারোটায়। মথুর রেগে গিয়ে বললেন, কটার সময় আসার কথা ছিল! ব্রাহ্মণ বললেন, আমি তিনটে কালীপুজো সেরে এলেম তো, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।

মথুর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, বাবা! শুনছ, এ মাকে বলে কি-না তিনটে, টে, মা আমার টে?

তাকে পুজো করতে দিলে না। পাওনা দিয়ে বিদায় করে দিলে। সেবার তন্ত্রধারক হল হৃদয়।

রামলাল ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন—তবে আমি আসি।

ঠাকুর বললেন, ওঁ কালী, ওঁ কালী। সাবধানে পুজো কোরো, সাবধানে, খুব সাবধানে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে ঠাকুরের এইবার বিদায় নেবার পালা। শেষ পূজা। রামলাল পূজারী, ঠাকুর দর্শক। ওই আসন, ঘণ্টা, কোষা-কুষি, পঞ্চপ্রদীপ, চামর কত নেড়েছি, ঘুরিয়েছি! এইবার বলি। সুস্নাতে, মাল্যভূষিত ছাগশিশু হাড়িকাঠের সামনে মৃদু মৃদু ডাক ছাড়ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরে চলেছেন নিজের ঘরে। বলির দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না।

১৮৮৫, ৬ নভেম্বর শুক্রবার। স্থান শ্যামপুকুর বাটী। রামকৃষ্ণলীলায় শেষ কালীপূজা। সব আয়োজন সমাপ্ত। ভক্তগণ বিমূঢ়। পট কোথায়? ঘট কোথায়? প্রতিমা কোথায়? আসনে উপবিষ্ট পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ। নিজেকেই নিজে পূজা করছেন।

পূজ্য পূজক এক হল
কালীর ছেলে কালী হল

কালকে পরাস্ত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।।

মানুষ আমার বিষয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের জন্যেই এসেছিলেন। অবশ্যই। তিনি ছিলেন মানুষের কারবারী। মানুষ আমার বিষয়। চতুর্দিকে পোকার মতো মানুষ কিলবিল করছে। 'পোকা' শব্দটির নিষ্ঠুর প্রয়োগ। বললেন না 'অমৃতের পুত্র'। বললেন, মানবজন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরলাভ। বললেন, এই দুর্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়। ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান।

জানোয়ার থেকে জান্তা হতে হবে। তোমার স্রষ্টা তোমার সঙ্গে নিষ্ঠুর এক রসিকতা করেছেন। স্বরূপ ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। ফিতে মাপা দুটি পিল্লে-জন্ম আর মৃত্যু। মায়া দিয়ে ঘেরা। কখনও সুন্দরী, কখনও পিশাচী। সবাই ভেল্কিই দেখতে চায়, জাদুকরকে কেউ দেখতে চায় না।

আমিই সেই, আমিই ব্রহ্ম একথা তুমি তখনই বলতে পারবে যখন তোমার আমি-বোধটা থাকবে না। আমি-আমার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তুমি মায়ার বশ। আর কলির মায়া হল, কাম কাঞ্চন। হরেক রকমের বাসনা। নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারবে। দুনিয়া জোড়া তাণ্ডব-বিষয় আর বিষয়ী এই হল সার্কাস।

তাই যদি হবে, এইটাই যদি আমাদের ভাগ্যের লিখন হয়, তাহলে তিনি কষ্ট করে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেন কেন! শরীর পাত করা সাধন করলেন কেন? দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পঞ্চাশ বছরের জীর্ণ শরীরখানি যখন ছেড়ে গেলেন তখন হাড়ের খাঁচাটি ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁর দেহাবসানের চার বছর পরে, ১৮৯০ সালে নরেন্দ্রনাথ তাঁর পরমসুহৃদ কাশীর জমিদার প্রমদাবাবুকে লিখছেন, 'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিণু' করিয়াছি। তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না। সেই মহাপুরুষ যদ্যপি ৪০ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিভূতিমান্ হইয়াও অকৃতকার্য হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কি করতে চেয়েছিলেন! উত্তর, স্বামীজি যা করেছেন। যে কর্মপ্রবাহ প্রবাহিত করে গেছেন। দক্ষিণেশ্বরের দেবভূমি থেকে সামান্য সামান্য সংবাদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসতে লাগল কলকাতার ভোগীসমাজে। মানুষ তৈরি সন্ন্যাসী দেখেছে। গেরুয়াধারী, মালাধারী। কোনও গেরুয়ায় লালের ভাগ বেশি, কোনও গেরুয়ায় হলুদ বেশি। সন্ন্যাসী তৈরি হওয়াটা তাঁরা দেখেননি। সেটি গুরু-

শিষ্যের নিভৃত ব্যাপার। সাধারণ মানুষ ধর্মের জগতের যাঁদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা হলেন পুরোহিত। শাস্ত্র ব্যবসায়ী। গৃহীরা তাঁদের কাছে যজমান। পাওনাগণ্ডা নিয়ে দরদস্তুর চলে। এঁরা শালগ্রামের অধিকারী। গামছাধারী। পূজার শেষে চাল-কলা বাঁধেন। বগলে ছাতা। শ্রাদ্ধের পাওনা। বিবাহে চার হাত এক করেন। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করে মৃতকে পরলোকে পার্সেল করে দেন।

বাংলার বৈষ্ণবকুল তখন প্রবল। ভাগবতাচার্যদের বিশাল দাপট। মহাপ্রভু বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়ে গেছেন। ভেকধারী বৈষ্ণবরা 'নাম' নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মন্ত্র হল—নামে রুচি, জীবে দয়া। হরের্নামৈব কেবলং! বালক গদাধর কামারপুকুরের সংসারজীবন দেখছেন, যেমন দূর কোনও গ্রহ থেকে বেড়াতে এসেছেন। লাহাবাবুরা সম্পন্ন মানুষ। কামারপুকুরের অগ্নিকোণে পুরী যাওয়ার পথের ধারে জমিদার লাহাবাবুরা যাত্রীদের জন্যে সদাব্রত পান্থশালা নির্মাণ করে রেখেছেন। অতিথিশালার আকর্ষণে বালক ছুটে যেতেন। কোথাও রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। কোথাও ভাগবত। শৈশবস্মৃতির কথা বলছেন, 'বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্যদের শোনাতুম। মেয়েদের ঢও বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা, সুর নকল করতুম। সাধুরা যা পড়ত, বুঝতে পারতুম। পণ্ডিত এসে সংস্কৃতে কথা কইলে বুঝতে পারতুম।' গান শোনা মাত্রই শিখে যেতেন—'ধরো না ধরো না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে...। এক-এক যাত্রার সমস্ত পালাটাই গেয়ে দিতে পারতুম।'

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেখার অফুরন্ত সুযোগ এগিয়ে দিচ্ছে লাহা জমিদারদের ওই পান্থধাম। রমতা সাধুরা আসছেন, থাকছেন, চলে যাচ্ছেন। আসক্তিহীন মানুষ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু। শাস্ত্র আলোচনা করছেন। ইট সাজিয়ে কাঠের আগুনে যা হয় কিছু ফুটিয়ে নিচ্ছেন। চলে যাওয়ার পর পড়ে থাকছে, পোড়া ইট, কাঠ, ছাই। দেখছেন ধর্মনির্ভর গৃহীদের। ঢও করে পুরাণ পড়ে শোনাচ্ছেন পোড়খাওয়া, পাকা বাঁশ সংসারীদের। প্রণামী টেঁকে পুরে বেরিয়ে পড়ছেন আর এক আসর মাত করতে। এঁদের দেখেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে পেরেছিলেন তাঁর ভক্তদের, এক ভাগবত পাঠক রোজ রাজামশাইকে ভাগবত শোনান। পড়া শেষ হলে রাজামশাইকে জিজ্ঞেস করেন, রাজামশাই কিছু বুঝলেন, রাজা বলেন, আগে তুমি বোঝো। রোজই এই এক ব্যাপার। ঠাকুর বলছেন, 'লোকটা সাধন ভজন করত—ক্রমে চৈতন্য হল। তখন দেখলে যে হরিপাদপদ্মই সার, আর সব মিথ্যা। সংসারে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে বলতে যে—রাজা, এইবার বুঝেছি। আর একটি গল্প বলতেন। শুরুতেই বাস্তবদর্শন, 'সংসারী লোকের অবসর কই? একজন একটি ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তার বন্ধু বললে একটি উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত

আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষবাস দেখতে হয়। চারখানা লাঙল, আটটা হেলে গরু। সর্বদা তদারক করতে হয়, অবসর নাই। যার পণ্ডিতের দরকার সে বললে, আমার এমন ভাগবত পণ্ডিতের দরকার নেই, যার অবসর নেই। লাঙল-হেলেগরু-ওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন পণ্ডিত চাই যে আমাকে ভাগবত শোনাতে পারে।'

বলেই বলছেন, 'তবে কি এদের ঘৃণা করি?'

ঘৃণা করবেন কেন? তিনি যদি ঈশ্বর হন, ভগবান হন, তাহলে তিনি এসেছেন তাঁর জমিদারিতে। তিনি সেই স্রষ্টার 'অ্যামবাসাডার'। কিছু ওষুধ-বিষুধ নিয়ে এসেছেন। ভবরোগের বৈদ্য তিনি। কখনও মানুষ, কখনও ভগবান। অবতার আর সাধকে এই তফাত। সাধকের গতি একমুখী। তিনি এগোচ্ছেন। ঈশ্বরের দিকে। আর অবতার? তিনি এগোতেও জানেন পেছতেও জানেন। ফোর ডাইমেনশানে তাঁর বিচরণ। কখনও সসীমে, কখনও অসীমে।

ঠাকুর বলছেন, 'তবে কি এদের ঘৃণা করি? না, তখন ব্রহ্মজ্ঞান আনি। তিনিই সব হয়েছেন—সকলেই নারায়ণ। কামারপুকুরে বালক গদাধরের দর্শন ছিল, সিদ্ধান্ত ছিল না। পৃথিবীর নিয়মে বালক ভগবান বালকই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কোনও অলৌকিকত্ব নেই। তিনি পুরাণের চরিত্র নন, ইতিহাসের চরিত্র। বারে বারে বলতেন, আমি তোমাদেরই মতো মানুষ একজন। তোমাদের জীবনের অংশীদার। তোমাদের সঙ্গে আমার সামান্য যে তফাত তা হল—আমি দেখি, ভেতরে দেখি, বাইরে দেখি। নিরাসক্ত হয়ে দেখি। আমার কাছে একটিই মাত্র অলৌকিক জিনিস আছে—একটি দিব্য চালুনি। মানুষকে চেলে আলাদা করি। মোটা দাগের মানুষ আর সূক্ষ্ম বোধের মানুষকে। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীবজন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভালো আছে মন্দ আছে। বাঘের মতো হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে; আবার বিষফলও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভালো আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে অসাধুও আছে; সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত আছে।'

মানুষের প্রকার আলাদা করছেন। বলছেন চার প্রকারের মানুষ আছে। বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব আর নিত্যজীব। নিত্যজীব পুরাণের চরিত্র, যেমন নারদ। এঁদের ভূমিকা—সংসারে থাকেন মানুষের মঙ্গলের জন্যে। শিক্ষা দেবার জন্যে। বদ্ধজীব কি রকম? বিষয় ছাড়া কিছু জানে না। জানতেও চায় না। কে ভগবান? ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। চিন্তা করার দরকার হয় না। সংসারের মতো উত্তেজনা ছেড়ে অদৃশ্য, অলৌকিক ভগবানের জন্যে মাথা খারাপ করার মানে হয় না।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের গায়েই যদু মল্লিকের বাগান। সেখানে যতীন্দ্রমোহন

ঠাকুর এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত। 'আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, কর্তব্য কি? ঈশ্বরচিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কিনা?' যতীন্দ্র বললেন, 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্ঠিরই নরকদর্শন করেছিলেন!' তখন আমার বড় রাগ হল।' বললুম, 'তুমি কিরকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরকদর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি—এসব কিছু মনে হয় না!'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত ছিলেন। কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুর। সেকালের বিরাট ধনী রানী রাসমণির দেবালয়ে পূজারী। ঘোরতর বিষয়ীদের আড়তে নিষ্কলুষ এক যুবক। আত্মমগ্ন। পূজাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার কোনও বাসনাই নেই। চালচলন দেখলেই মনে হয় জগৎছাড়া মানুষ। চারপাশে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা কেমন! কোনও কোনও কর্মচারী পরদারসেবী। রাতের বেলা তাঁরা অন্য জগতে বিচরণ করেন। কোনও শরিক মন্দিরের আলু, কপি, আনাজপত্র গাড়ি বোঝাই করে বাড়িতে চালান দিচ্ছেন। স্থানীয় মানুষ গঙ্গার ঘাটে এসে তেল মাখতে মাখতে পরচর্চা করছেন। মাঝেমধ্যে বিরাট ঘটা করে উৎসব হচ্ছে। যাত্রা, গান। দক্ষিণেশ্বর থেকে কুটিঘাট পর্যন্ত গঙ্গার তীর আলোর মালায় সজ্জিত হচ্ছে। পরে ভক্তদের বলেছিলেন, 'রাসমণি কালীবাড়ি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে ঈশ্বর করেছেন।' জমিদার মথুরবাবু, রানীর সেজ জামাই সেই রকমই তো চান। অর্থ, বিত্ত মানুষকে রজোগুণী করে, অহঙ্কারী করে। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিষ্টি একটি ছেলে। তিনি অন্যান্যদের মতো চাকর নন। ত্রাণকারী পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। তাঁর সুচিন্তিত বিধানের ফলেই মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। তিনি সম্মানিত, শ্রদ্ধেয়। চালকলা বাঁধা সামান্য পুরুত নন। তাঁর ছোট ভাই শ্রীরামকৃষ্ণ।

সেজবাবুর নজর পড়ল। অনেক লোভী মানুষের সমাবেশে এই নির্লোভ, সুমিষ্ট যুবকটিকে আমার ভালো লেগেছে। শিল্পবোধ আছে। অপূর্ব মূর্তি গড়েছে মহাদেবের। বিষয়ীদের ধারে কাছে সহজে আসে না। গঙ্গার তীর তার বিচরণ-ভূমি। ধুরন্ধর মথুরামোহন। লেঠেল দিয়ে জমিদারি চালান। তাঁর শাশুড়ি রাসমণি, রানী, আরও বেপরোয়া। ইংরেজদের কাঁপিয়ে দিয়েছেন। সেজবাবু সদ্য যুবক এই ছেলেটিকে ধরলেন; কিন্তু প্রকৃত কে ধরলেন? ধরলেন মা কালী! রানী সদলে কাশী যাচ্ছিলেন। প্রথমে তো ধরা পড়লেন তিনি। কাশী থেকে কালী। এক মতে, নৌকার-বহর দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত এসে থেমে পড়ল। রাতের বিশ্রাম। স্বপ্ন। রাসমণি! যাও কোথায়? আমি গঙ্গার তীরে তোমার পূজা গ্রহণ করব। আমাকে প্রতিষ্ঠা করো! 'গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল।' মথুরবাবু বালিতে ভূমি সংগ্রহের চেষ্টা করলেন। বিরোধী ভূস্বামীদের শত্রুতায় জমি পাওয়া গেল না। এর পেছনেও

মায়ের হাত। শাস্ত্রসম্মত উপযুক্ত স্থান রয়েছে পূর্বতীরে। শক্তির শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান কূর্মপৃষ্ঠ শ্মশান। সুপ্রীম কোর্টের অ্যাটর্নি হেস্টি সাহেবের জমি। একাংশে একটি কুঠি। আর একদিকে মুসলমানদের কবরডাঙা আর গাজীসাহেবের দরগা। প্রায় ছশো ফুট গঙ্গার দিকে পোস্তার নির্মাণ কাজ শেষ হল। সুন্দর ঘাট তৈরি হল। প্রবল বানে সব চুরমার হয়ে গেল। তখন নির্মাণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল সাহেব কোম্পানি 'ম্যাকিন্টশ'কে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অনুসন্ধান ছিল পৃথিবীর এই মায়াভূমিতে—প্রস্তরে কি প্রাণ থাকে। সেই সন্দেহ নিরসন করেই মা আসন নিলেন রৌপ্যসিংহাসনে। মন্দির নির্মাণে বিলম্ব। মূর্তি পাছে ভেঙে যায় তাই প্যাকিং বাক্সে নিরাপদ। অনেকদিন হয়ে গেল। রাতে রানী স্বপ্ন পেলেন, 'আর কতদিন এইভাবে আমাকে আবদ্ধ করে রাখবি? আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে রাসমণি!' প্যাকিং বাক্স খুলে দেখা গেল, মা ঘেমে গেছেন।

জীবন্ত মাকে সাধারণ পূজারী কেমন করে পূজা করবেন! মা নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে রেখেছেন। কেউ জানে না। ক্রমে জানবেন। এমন কাণ্ড ঘটাবেন, যা শুধু ধর্ম নয় ইতিহাস। মথুরবাবু বললেন, 'গদাধর তুমি হবে মায়ের বেশকারী। মাকে মনের মতো করে সাজাবে। গান শোনাবে, কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছে মা পদ দিয়ে।'

বেশকার থেকে পূজারী। মন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে কাতর প্রার্থনা—দেখা দাও। দেখা না দিলে আমি মরে যাব। আমি চুরমার হয়ে যাব। আমি মূর্খ বলে দেখা দিবি না? মা হাসছেন। হাসছিস পাষাণী? তা হলে এই নে। ছাগলের বদলে মানুষ। নরশির। আহা মা তো! পাথরের মা হলে কি হবে? যত মন্ত্র, যত নিবেদন সব তো জীবন্ত মায়ের কাছে! মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। শ্মশানবাসিনী, মৃত্যুরূপা কালীও আতঙ্কিত। করিস কি, করিস কি! বিচ্ছুরিত আলো। তরঙ্গায়িত জ্যোতিঃ। ঢেউয়ের পর ঢেউ। পেলব পূজারী সংজ্ঞা হারালেন। গর্ভমন্দিরের চৌকাঠ দীর্ণ হল। পূজার যত সামগ্রী মুহূর্তে চৈতন্য লাভ করল। চারপাশ জমজম করে উঠল। সেই গণ্ডির বাইরে সব থমথমে। যে আসে তার বুক কাঁপে। এ প্রাণপ্রতিষ্ঠা সাধারণ পুরোহিতের সাধ্যের বাইরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম ধরা দিলেন এক গৃহীকে। তিনি হলেন স্বয়ং মথুরবাবু। মথুরবাবু এ কি দেখছেন! ছোট ভটচাজ্ কুঠিবাড়ির বারান্দায় পায়চারি করছেন। যখন ওদিকে যাচ্ছেন শিব। যখন ওদিক থেকে এদিকে আসছেন মা কালী। শিক্ষিত মথুরামোহন। প্রিন্স দ্বারকানাথ তাঁর বন্ধু। যুক্তিবাদী যুগের তরতাজা এক তরুণ। অলৌকিকে অবিশ্বাসী। গদ্গদ ভক্তি তাঁর নেই। নিশ্চয় দৃষ্টিবিভ্রম! বারবার সেই একই দর্শন! তাহলে ইনি কে? ছুটে গিয়ে পায়ের কাছে নতজানু। পড়ে রইল

আরামকেদারা, ফরসির নল। তছনছ হয়ে গেল সম্ভ্রান্তের অহংকার। প্রভুর পদতলে লুটিয়ে দিলেন পদমর্যাদা। 'আমি ধরে ফেলেছি তোমাকে। ছোট ঠাকুর! আর লুকাবি কোথায় মা কালী! আমি তোমার সেবক! আমি জেনেছি, তোমার সেবা করার জন্যেই আমি পৃথিবীতে এসেছি!'

বিজ্ঞান আর ভগবান এই তর্কেরও অবসান। প্রকৃতির নিয়মে জগৎ চলছে। বেনিয়ম হতে পারে না। ভগবানও অসহায়। ঊনবিংশ শতকের কলকাতায় বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের ঝোড়ো বাতাস বইছে। যুক্তির যুগ। ঈশ্বরও প্রাকৃতিক নিয়মের বশ। কলাকাতায় তখন অনেক ইন্টেলেকচুয়াল। অগ্রগণ্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। মথুরবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক। পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক হবেন। ডঃ সরকার বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র সদস্য ছিলেন। শুধু ধর্মচর্চা নয়, বিজ্ঞানচর্চাও সমানতালে চলেছে।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে বলে বসলেন, ভগবান নিয়মের অধীন। নিয়ম-বহির্ভূত কাজ তিনিও করতে পারবেন না। তর্কটা এই দাঁড়াল, নিয়মের ভগবান, না ভগবানের নিয়ম! শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ় বিশ্বাস, সবই মায়ের ইচ্ছা। তিনি মায়ের কোলে বসে আছেন।

মথুরবাবু বললেন, কই দেখি, লালজবা গাছে তিনি সাদাজবা ফোটান তো! শিব আর কালী দেখেছিলেন, এইবার দেখবেন, একই ডালে লাল আর সাদা জবা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, মায়ের ইচ্ছে হলে তাও হতে পারে। যে-দিন তর্ক হল, তার পরের দিন সকালেই এই ঘটনা। মথুরবাবু স্তম্ভিত।

মায়ের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্গুরু হবেন। তারই প্রকাশ রাসমণিকে শাসন। মন্দিরের কর্মচারীরা আঁতকে উঠলেন। সর্বনাশ! রানীমাকে চড় মেরেছেন! চাকরিটা এইবার গেল! যাও, গাঁয়ে গিয়ে ভিখ মেগে খাও। রানী জপ আর বিষয় চিন্তা করছিলেন। প্রথম কৃপা তাঁর ওপরেই বর্ষিত হল। মৃদু আঘাতে চমকে উঠলেন। জড়সড় হয়ে গেলেন অপরাধীর মতো। এ তো সাধারণ মানুষ নয়! মন পড়তে পারেন। বই পড়তে না পারলে কি হবে। ঈশ্বরের লেখা এই মানুষটি পড়তে পারেন। মা কালীকে যিনি পেয়েছেন, তিনি তো পঞ্চাশৎ বর্ণমালাও পেয়ে গেছেন। মায়ের গলার মুণ্ডমালায় ঝুলে আছে পঞ্চাশটি বর্ণ। মা যে অনন্তের কেতাব।

মন্দিরের নায়েব, খাজাঞ্চি, কর্মচারী, দক্ষিণেশ্বর গ্রামের অধিবাসী, কেউ চিনল না। চিনলেন তিনজন। মালী ভর্তাভারী, রসিক মেথর আর মন্দিরের পাশে সরকারী বারুদখানার প্রহরী, সৈন্যবাহিনীর কুঁয়ার সিং।

ধর্মের জগতের স্বাভাবিক নিয়ম-সাধনার পর সিদ্ধি। ইষ্ট দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে বিপরীত—আগে সিদ্ধি, তারপর শাস্ত্রধরে সাধন। গুরুর

মর্যাদা, গুরুর প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে না যায়! মানুষের ছদ্মবেশে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন দক্ষিণেশ্বরে। গুরুরা সেটি না জেনেই পরীক্ষা দিতে আসছেন। প্রথম গুরু বিদুষী ভৈরবী। আদেশ পেয়েছেন, তিনজনকে তন্ত্রসাধন করাতে হবে। দুজনের দেখা পেয়েছেন পূর্ব দেশে। তৃতীয় জন রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে। খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছেন এক সকালে।

তন্ত্রসিদ্ধ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। চৌষট্টি তন্ত্রের দুরূহ সাধনা অক্লেশে, অনায়াসে শেষ করলেন। প্রায় চার বছর ধরে তন্ত্রসাধন চলেছিল। এরপর শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন গুরুর গুরু। ভৈরবী! তুমি যে এখনও অপূর্ণ। তন্ত্র আমাকে দিলে, গ্রহণ করলুম। স্বীকার করলুম, এইবার তুমি চলে যাও বৃন্দাবনে। জ্ঞানের অহঙ্কার, অধিকারের অভিমান ফেলে দিয়ে প্রেম সাধ। নাহং, নাহং, তুঁহুঁ, তুঁহুঁ। ঈশ্বর হলেন প্রেম। তিনি সমন্বয়। বহুকোণ বিশিষ্ট একটি রত্ন।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাস নিলেন। গুরু নিজেই এলেন পরিব্রাজকাচার্য পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী। জটাজূটধারী, দীর্ঘদেহী, পুরী সম্প্রদায়ের সাধু। তন্ত্র করলে, মধুরভাব সাধলে, এবার নিরাকারে চলো। বেদান্তের পথ ধরে সমাধিতে। অতি গোপনে পঞ্চবটীর সাধনকুটিরে শুরু হল সাধন। বিরজা হোম সমাপ্ত, শিখা, সূত্র ত্যাগ। 'আমি'-র বিসর্জন হোমাগ্নিতে। তোমার মৃত্যু হল। তুমি এখন ব্রহ্মলীন। ওঠো, উঠে যাও, ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে। অনন্তে। গভীর রাত। আসনে শিষ্য। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো। নির্বিকল্প আত্মধ্যান। এই প্রথম ভগবান হার স্বীকার করলেন মানুষ গুরুর কাছে। শিবরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মে প্রবেশ করতে পারছেন না। শক্তি সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। ভ্রূমধ্যে মা কালী হাসছেন। শুভ্র দন্তপঙ্ক্তি। বিজলি ঝিলিক।

ওগো! আমি পারছি না। মায়া থেকে বেরোতে পারছি না। রূপ থেকে অরূপে যেতে পারছি না। আমার হচ্ছে না।

মধ্যরাত। হোমের শিখা সংযত। গুরুর হুঙ্কার, কেঁও হোগা নেহি! ঘরের কোণে এক টুকরো ভাঙা কাচ। ফলার তীক্ষ্ণ দিকটা ভুরুর মাঝখানে জোরে চেপে ধরে বললেন, 'হিঁয়া রাখো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান-খড়্গ বের করলেন। এবার যেই মা এলেন মোহিনী মূর্তিতে সঙ্গে সঙ্গে কেটে দু'খণ্ড করে দিলেন। মন হু হু করে এই নামরূপ রাজ্যের ওপরে উঠে গেল। গুরু তোতাপুরী অনেকক্ষণ বসে রইলেন সামনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সাধনার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলতেন, 'মন হু হু করে সমগ্র নামরূপ রাজ্যের ওপরে চলে গেল—আমি সমাধিস্থ হলাম।' নাগা সন্ন্যাসী ল্যাংটা তোতাপুরী সাধনকুটিরের দরজায় তালা দিয়ে বাইরে পাহারায় বসলেন। ভেতরে থেকে ইঙ্গিত এলে দরজা খুলে দেবেন। দিন গেল, রাত এল,

তিন দিন এইভাবে অতিবাহিত হল। গুরু তোতাপুরী ভয় পেলেন। কি হল! তালা খুলে কুটিরে প্রবেশ করলেন।

যেমন রেখে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক সেইভাবেই বসে আছেন। দেহ যেন প্রাণহীন; কিন্তু মুখমণ্ডল প্রশান্ত গম্ভীর, জ্যোতির্ময়। নিবাত নিষ্কম্প একটি দীপশিখা। এই মূর্তিই আজ মন্দিরে মন্দিরে। গৃহী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। অজুত কণ্ঠে বন্দিত,

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নর-রূপ ধর, নির্গুণ গুণময়।।
অশ্রুসিক্ত শত চক্ষু। নরদেব দেব,
জয় জয় নরদেব। তুমি ভববৈদ্য।

গুরু তোতাপুরী বিস্মিত—'য়হ ক্যা দৈবী মায়া!' ইয়া দৈবী মায়া! এই অবস্থায় আসতে গুরুর লেগেছিল ছেচল্লিশ বছর, শিষ্যের লাগল মাত্র তিনদিন।

একটানা এগারো মাস দক্ষিণেশ্বরে থেকে তোতাপুরী যেমন এসেছিলেন ঠিক সেইভাবে চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের পথ ঠিক করে নিলেন, 'রসে বশে' থাকব। শুকনো সন্ন্যাসী হব না। ওপরতলা থেকে, হেড কোয়ার্টার থেকে আদেশ এল, 'ভাবমুখে' থাক। জনক রাজার মতো দুটো তরোয়াল ঘোরাও, একটা জ্ঞান আর একটা ভক্তি। সাকার আর নিরাকারের মধ্যে 'বাচ' খেলাও। কখনও ব্রহ্মে থাক, কখনও মায়ায়। গোখরো সাপ হয়ে যাও, বৈরাগ্য বিষের ছোবলে বিষয়-বিষ নাশ করে দাও। যারা আসবে তাদের লটকে দাও। ভক্তকণ্ঠে যুগযুগ ধরে গীত হোক, মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং/তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।

শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিবাড়ির ছাতে উঠে আজান দিলেন, সব চলে এসো। যে যেখানে আছ সব চলে এসো। দুটো ভক্তির কথা কই, দুটো ভগবানের কথা কই। সন্ধ্যার বাতাসে সেই আহ্বান চরাচরে ভেসে গেল—কলিং, কলিং, শ্রীরামকৃষ্ণ কলিং। শ্রীরামকৃষ্ণ ওয়েভ। তৈরি হবে শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য—এম্পায়ার। আমি বসে আছি তোমাদের জন্যে ভাব সাজিয়ে। গৃহীদের জন্যে কৃপা, সন্ন্যাসীদের জন্যে মুক্তি। আমি ঈশ্বরের জন্যে 'ষোল টাং' করেছি, তোমরা একটাং করো।

When Keshab speaks, the world listens। ব্রহ্মর্ষি কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে যোগাযোগে কামারপুকুরের দরজা এইবার কলকাতার দিকে খুলে গেল। যুবক গদাধর মথুরবাবুর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজে গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা—'সেজবাবুর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম কেশব সেন বেদিতে বসে ধ্যান করছে। তখন ছোকরা বয়স। আমি সেজবাবুকে বললাম, 'এই ছোকরার ফাতনা ডুবেছে—বঁড়শির কাছে মাছ এসে ঘুরছে।' দুজনের দেখাদেখি। কেশবচন্দ্র সেই দর্শনের দার্শনিক—একমেবাদ্বিতীয়ম।

ঈশ্বর এক। অনন্ত ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন—একই বহু হয়ে বসে আছেন। তাঁর ইচ্ছা। বহুর মধ্যে এক। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কিরকম? একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হল—ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল, জগন্নাথের গায়ে ঠেকে কিনা। একবার এ-ধার থেকে ও-ধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—দেখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নেই, আবার দণ্ড এধার থেকে ও-ধারে লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল। তখন সন্ন্যাসী বুঝলে যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

এইবার কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন। ইংরেজি 'সানডে মিরর' পত্রিকার ১৮৭৫ সালের ২৮ মার্চ-এর সংখ্যায় লিখলেন, 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে দর্শন করেছি। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরের সরলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কথার মাঝে ব্যবহৃত নিরবচ্ছিন্ন উপমা ও রূপক যেমন সুসঙ্গত, তেমনি সুন্দর। অতি শান্ত, কোমল ও চিন্তাশীল।'

When Keshab Speaks—বিশিষ্ট, বিদগ্ধ, প্রতিষ্ঠিত, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের ঘরে সংবাদমাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবেশ। ধর্মচর্চা তখন একটা 'ক্রেজ'। ফিলজফি আর ফিজিক্স পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে এগোচ্ছে। কান্ট, হেগেল, হিউম, নিউটন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, চার্বাক, শঙ্কর, রামানুজ, বেদান্ত, ভাগবত—চলো যাই, দেখে আসি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে—When Keshab says,

॥ ১৮৭৯, নভেম্বর ১৩॥

গোখরো সাপের ঘরে দুই অজ্ঞেয়বাদীর প্রবেশ। ঈশ্বর মানেন না। ভেতরে একটা 'ভ্যাকুয়াম'। সংসারের সব আনন্দ 'স্টেল' হয়ে গেছে। 'নো পাঞ্চ'। জীবনটাকে কিভাবে 'মিনিংফুল' করা যায়! চলো যাই।

দরজার বাইরে দুজন। ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত আর ব্যবসায়ী মনোমোহন মিত্র। দুজনে পরস্পরের আত্মীয়। কড়া নাড়লেন। দরজা খুললেন একজন। কোথায় সেই সন্ন্যাসী, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ!

পরমহংস কোথায় জানি না বাপু! এই রামকৃষ্ণ তোমাদের সামনে। 'বসুন, বসুন'। বসুন তো বসুন। একেবারে বসিয়ে দিলেন। রামচন্দ্র আজও বসে আছেন ঠাকুরের সঙ্গে কাঁকুড়গাছির 'যোগোদ্যানে'। যক্ষ মোহরের কলসি আগলায়। রামচন্দ্র আগলে আছেন ঠাকুরের ভস্মাধার।

বিষের ছোবল নয় প্রেমের ছোবলে দুজনেই বিমোহিত। উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় গৃহে ফিরে এলেন দুই গৃহী, অবিরত ভেতরে ধ্বনিত হচ্ছে সেই আহ্বান—'আবার

এসো।' অন্তরে অবিরত আরতি।

. . .

॥ ১৮৮০॥

এলেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। ডস্ট কোম্পানির (Dost) মুৎসুদ্দি। প্রচুর উপার্জন। মদ্যপান, বেশ্যাগমন। কিন্তু উদার। বিপদ্গ্রস্ত, অভাবী মানুষকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করতেন। সব আনন্দই ক্রমে বিস্বাদ। অর্থ আর প্রলোভন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে। প্রথম ঘণ্টা বাজালেন অদ্ভুত এক সন্ন্যাসিনী। মিত্তিরমশাই এক দ্বিপ্রহরে পথে হাঁটছেন, হঠাৎ প্রদীপ্ত চেহারার এক সন্ন্যাসিনী কাছে এসে একটি কথাই বললেন, 'বাছা, একমাত্র তিনিই সত্য, আর সবই মিথ্যা।' আর কোনও কথা নেই। তিনি নিমেষে অদৃশ্য হলেন নিমতলার পথে।

কে এই সন্ন্যাসিনী! শ্রীরামকৃষ্ণ নন তো!

ভেতরে শুরু হয়ে গেল ডামাডোল। ইন্দ্রিয়দের বশে আনার উপায়! পরাজিত সুরেন্দ্র। এ-জীবন তবে আর রাখি কেন! রামচন্দ্র দত্ত বললেন, তুমিও চল। তিনি ছাঁদ বদলে দিতে পারেন। অহংকারী সুরেন্দ্র বললেন, 'তোমার সাধুটি যদি প্রতারক হন, তবে কান দুটি মলে দিয়ে আসব।'

উদ্ধত ভঙ্গি। ঠাকুরকে কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করলেন না। ভক্তদের মধ্যে বসলেন, বিশিষ্ট একজন। কান মলে দেবেন। ঠাকুর তাঁকে সরাসরি কিছু বললেন না। ভক্তদের বলছিলেন, সুরেন্দ্র শুনলেন। ঠাকুর বলছেন, 'মানুষ বেড়ালছানার মতো ব্যবহার করে না কেন? বানরছানার মতো ব্যবহার করে কেন? বানরছানা মায়ের পেট আঁকড়ে ধরে থাকে। নিজের চেষ্টা। ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবে। বেড়ালছানা পড়ে পড়ে মিউ মিউ করে। তার মা নড়া ধরে যেখানে নিয়ে যায় সেইখানেই থাকে। দেখ আত্মচেষ্টায় কাজ করা, আর ভগবানের উপর নির্ভর করে পড়ে থাকার মধ্যেও এই তফাত।'

সুরেন্দ্র চমকে উঠলেন, 'এ-কথা তো তাঁকেই বলা হচ্ছে। আমি তো বানরছানার মতোই চলি। সুরেন্দ্রনাথের ভক্তি ছিল। অন্তর ছিল। সংস্কার ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ওয়েভ লেংথ ধরতে পারলেন। আমার জীবনের দুঃখ দূর করতে হলে আমাকে সমর্পিত বেড়ালছানা হতে হবে। বিদায়কালে ঠাকুর বললেন, 'আবার এসো—আসতে ভুলো না।' ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রর সংশয় ঝরে গেছে। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

সুরেন্দ্র শুধু এলেন না। তিনি হলেন ঠাকুরের অন্যতম রসদদার। কথামৃতকার মাস্টারমশাই লিখলেন, 'ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারই হাতে গড়া! তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ মূর্তিমান করিলেন। কৌমার

বৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্মা নরেন্দ্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দুধর্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। ভাই, তোমার ঋণ কে ভুলিবে?'

।। পাঁচ ফুলের সাজি ।।

ঠাকুরকে ঘিরে একটি অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী তৈরি হল। ১৮৮১ থেকে ১৮৮২-র মধ্যেই অন্তরঙ্গ গৃহীভক্তরা সব এসে পড়লেন। সুরেন্দ্র মিত্রের সমসময়েই এলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'প্রেমিক ভকত এক আইলা আসরে।' তিনি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। ঢাকায় সরকারী অফিসে অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ করতেন। হালিশহরবাসী। ঠাকুরকে প্রথম দর্শন ১৮৮০ সালে।

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়।। 'জুটিলেন ভবনাথ পরমসুন্দর। ১৮৮১ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথ জুটিকে বলতেন 'হরিহরাত্মা'। ঠাকুর বলতেন, নরেন্দ্রনাথ 'পুরুষ', ভবনাথ 'প্রকৃতি'।

বলরাম বসু।। 'মনোহর ভক্তবর বসু বলরাম / শহর অঞ্চলে বাগবাজারেতে বাস।।' ১৮৮২ সাল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলায় তাঁর বিরাট ভূমিকা। একমাত্র বলরাম ভবনেই ঠাকুরের সর্বাধিকবার পদার্পণ। ভবন রূপান্তরিত হল 'মন্দিরে'। ঠাকুর বলতেন আমার কলকাতার 'কেল্লা'।

মাস্টার (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)।। ১৮৮২, ২৬ ফেব্রুয়ারি। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এলেন ঠাকুরের সন্দর্শনে। শুরু হল, 'কথামৃত'। মাস্টারমশাই লিখছেন, 'সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত।' তারিখটি স্পষ্ট করে বললেন না। রহস্যে ঘিরে রাখলেন—'বসন্তকাল, ইংরেজি ১৮৮২, মার্চ মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে।'

গিরিশচন্দ্র।। দূর থেকে দেখলেন, বাগবাজারের দীননাথ বসুর বাড়িতে। একেবারে মুখোমুখি হলেন 'স্টার থিয়েটারে'। তারিখ, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪, রবিবার। ঠাকুর স্টারে 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এলেন। অবশেষে গিরিশ বলবেন, 'প্রভু, তুমিই ঈশ্বর, মানুষদেহ ধারণ করে এসেছ আমার পরিত্রাণের জন্যে।'

Soldiers of Ramkrishna.

একেবারে উপযুক্ত শিরোনাম। শ্রীরামকৃষ্ণের সৈন্যবাহিনী। **এম্পারার রামকৃষ্ণ। জেনারেল নরেন্দ্রনাথ।** ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে, পশ্চিমের গঙ্গার দিকের দরজা দিয়ে নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ। বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। গঙ্গার দিক থেকে গঙ্গার ধারা এল। ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা অবতরণ করিয়েছিলেন, শিব ধারণ করেছিলেন জটায়। শিবরূপী নরেন্দ্রনাথ এলেন রামকৃষ্ণ গোমুখীতে। রামকৃষ্ণ প্রবাহ এইবার মুক্ত হবে। শিব এলেন শক্তির ঘরে। শিব চেয়েছিলেন

সমাধি, শক্তি চাইলেন সমিধ্।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের সমাধি-স্বপ্ন ঘুচিয়ে দিলেন—তোর হাত কখানিও চাই। আমি বজ্র তৈরি করব। সত্যসত্যই বজ্রপাত হয়েছিল মহাসমাধির আগের দিন। লাটু মহারাজের স্মৃতি—'দুপুরবেলা একটা বাজপড়ার মতো আওয়াজ হয়েছিল। মা ও লক্ষ্মীদিদি সেই আওয়াজ শুনে ঠাকুরের ঘরে এসে গেলেন—লক্ষ্মী দিদি বড্ড ভয় পেয়েছিল।'

ত্যাগী পার্ষদদের মধ্যে ঠাকুর যে ছয়জনকে নিত্যসিদ্ধ বা ঈশ্বরকোটি বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তাঁরা হলেন—**নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন** আর **পূর্ণ**। এই ছ'জনের মধ্যে তিনজন বিবাহ করেছিলেন। পূর্ণ (পূর্ণচন্দ্র ঘোষ) গৃহী হয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে ঠাকুরের কাছে প্রথম আসেন। পিতা রায়বাহাদুর দীননাথ ঘোষ। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। পূর্ণচন্দ্রকে দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'বিষ্ণুর অংশে জন্ম'। তাঁর আগমনে ওই শ্রেণীর ভক্তদের আগমন পূর্ণ হল।

যোগীন্দ্র (নাথ রায়চৌধুরী), পরে স্বামী যোগানন্দ। নামেমাত্র বিবাহিত। ঠাকুর দেখামাত্রই ঈশ্বরকোটী বলে চিনেছিলেন।

রাখাল।। রাখালচন্দ্র ঘোষ, পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ঠাকুরের মানসপুত্র। আগমনের আগেই ঠাকুর তাঁকে ভাব-নেত্রে দেখেছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, রাখালের 'রাজবুদ্ধি'। নরেন্দ্রনাথ তাঁর ভাইদের আদেশ দিলেন, রাখালকে সবাই রাজা বলে ডেকো। রাখালচন্দ্র ছিলেন বিবাহিত। একটি সন্তান জন্মাবার পরেই চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করলেন।

ঠাকুরের রোলকল—**নরেন্দ্রনাথ**! আমি তোমার **বিবেকানন্দ**।

রাখাল রাজা! তোমার **ব্রহ্মানন্দ**।

যোগীন্দ্র, আমার অর্জুন! আমি **যোগানন্দ**।

বাবুরাম! আমায় আপনি **প্রেমানন্দ** করবেন।

নিরঞ্জন, শ্রীরামচন্দ্রের অংশ! হাজির, আমি **নিরঞ্জনানন্দ**।

তারকনাথ! আমি যে **শিবানন্দ**।

শরৎচন্দ্র! হাজির প্রভু! দক্ষিণেশ্বরে একদিন হঠাৎ আমার কোলে বসে আমার ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা করেছিলেন।

আমি **সারদানন্দ**। আমি মা সারদার ভারী।

শশীভূষণ ! প্রস্তুত। ভবিষ্যতের **রামকৃষ্ণানন্দ**।

কালীপ্রসাদ! রেডি স্যার! তুমি **অভেদানন্দ**।

লাটু! তুই অদ্ভুত, তাই **অদ্ভুতানন্দ**।

হরিনাথ! আমি **তুরীয়ানন্দ**।

গোপালচন্দ্র! তুমি আমার বুড়ো গোপাল। হয়ে যাও **অদ্বৈতানন্দ।**

সারদাপ্রসন্ন! প্রভু! তুমি প্রবেশিকা পরীক্ষার দিনে সোনার ঘড়ি হারিয়ে ফল খারাপ করে ফেলেছিলে। খুব মন খারাপ! সে তো আমার সঙ্গে দেখা হবে বলে! তুমি **ত্রিগুণাতীতানন্দ হবে!**

গঙ্গাধর! এদিকে এসো! তুমি হও **অখণ্ডানন্দ।**

সুবোধচন্দ্র! প্রভু হাজির। তোমার উত্তম বংশ। ঠনঠনিয়ার সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সেবায়েত শঙ্কর ঘোষের পৌত্র কৃষ্ণদাস তোমার পিতা। তুমি হবে সুবোধানন্দ। নরেনের বেলুড়মঠে তোমাকে সবাই আদর করে ডাকবে, '**খোকা মহারাজ**'।

হরিপ্রসন্ন! প্রেজেন্ট স্যা'র! বিজ্ঞানী আমার কাছে এসেছিলেন বলে তোমার মা বলেছিলেন, 'সেই পাগলের ওখানে গিয়েছিলে, যে সাড়ে তিনশ ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছে?' যাও, তুমি **বিজ্ঞানানন্দ** হয়ে নরেনের রামকৃষ্ণ মন্দির তৈরি করবে বেলুড়ে।

দুর্গাচরণ! কৃপা করুন প্রভু! তুমি 'নাগ মহাশয়' নামে বিখ্যাত হবে।

॥ সেই ছাত॥

কাশীপুর উদ্যানবাটীর ছাতে দাঁড়িয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিচের দিকে তাকালেন। শীতের নরম রোদে পড়ে আছে সবুজ উদ্যান। মনে হচ্ছে তপোভূমি। সন্ন্যাসীর দল তৈরি। আর কয়েকদিন পরেই তারা গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের মালা পাবে। উদ্যানের এককোণে নরেন্দ্র রোজ রাতে যে-ধুনি জ্বালিয়ে সকলকে নিয়ে ধ্যানে বসে তার ছাই ছড়িয়ে আছে।

ওই তো গৃহী ভক্তরা সব ঘুরছে। সংখ্যা তিরিশ ছাড়িয়েছে। এরা সব পরিচিত, কেউ রবাহূত নয়। ওই তো সব, আমার পাঁচ বছরের সঙ্গী—গিরিশ, তার ভাই অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী, হারাণ, রামলাল, অক্ষয়, উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাঁধুনী ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলী, ভূপতি, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হরিশ। ভক্তদের 'ফুল হাউস'। সব কড়াইয়ের ডালের খদ্দের। 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই! সংসারী জীবের কভু গতি নাই'। ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, 'আমায় উদ্ধার কর, হে ঈশ্বর'! যারা অন্তরঙ্গ, তারা বলে, রামকৃষ্ণ তুমি কে? তোমার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?

ঠাকুর রামলালকে নিয়ে নেমে এলেন উদ্যানে, গৃহীদের পাওনাটা আজ মিটিয়ে দি। প্রথমে গিরিশ। ঠাকুর সমাধিস্থ। অক্ষয়মাস্টার প্রমুখ কয়েকজন 'গাছের উপর ডালে ডালে বানর বানর' খেলা করছিলেন। অক্ষয় ছুটে এলেন। হাতে ছিল দুটি জহর চাঁপা। ঠাকুরের পায়ে রাখলেন।

ভাবস্থ ঠাকুর অকাতরে বলতে লাগলেন, 'চৈতন্য হোক', 'চৈতন্য হোক'।

ঠাকুর উঠে গেলেন দোতলায়। এরপর তিনি নামবেন নরেন্দ্রের কাঁধে চেপে।

॥ বিভাজন॥

এবার নরেন্দ্রাদি একান্ত পার্ষদদের দেখাতে হবে গৃহীদের স্বরূপ। গৈরিক শ্রীরামকৃষ্ণ বৈরাগ্যের চূড়া তুলবেন থই থই গৃহীদের মাঝে। সংসারসমুদ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের দিশারী আলো। চিরকালীন একটি সংগঠন—রামকৃষ্ণ মিশন। শীঘ্রই দেহঘট ভেঙে সেই শক্তিমণ্ডল রচনা করবেন। এমন কি পশ্চিম ভারতের একটি দুর্গও তাঁর দখলে আসবে। বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে **'রামকৃষ্ণ এম্পায়ার'**।

হিসেবীর চৈতন্য হওয়া মানে আরও হিসেবী হওয়া।

রামদত্ত প্রমুখ গৃহী ভক্তরা মাঝে মাঝেই উদ্যানবাটীর খরচের হিসেব দেখতে চাইতেন। একদিন প্রবল অশান্তি—'বেহিসেবী খরচ হচ্ছে। বড্ড বেহিসেবী খরচ।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তার মানে? আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করে এখানে চুরি করতে এসেছি?

'জান, ঠাকুরের সেবায় আপনাদের টাকা আমরা আর ছোঁব না। আমরা ভিক্ষে করে ঠাকুরের সেবা চালাব।'

নিরঞ্জন ভাইকে নির্দেশ দিলেন, ঠাকুরের ঘরে গৃহীদের প্রবেশ নিষেধ করে দাও।

শ্রীরামকৃষ্ণ একখানি গেরুয়া আর একটি মালা গিরিশচন্দ্রের জন্যে আলাদা করে রেখেছিলেন। ব্যতিক্রমী দুই গৃহী—গিরিশচন্দ্র আর সুরেন্দ্রনাথ।

গিরিশচন্দ্র হিসেবের কাগজ কুচি কুচি করে ফেলে দিলেন, 'শালার হিসেব! আমার বাড়ির ইট একখানা একখানা করে বিক্রি করে প্রভুর সেবার খরচ চালাব।'

ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বললেন, 'তুই আমাকে কাঁধে করে যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই থাকব।'

শেষ আদেশ। সেটি বলার জন্যেই এই পটভূমি। পরোক্ষ নির্দেশ হল—সংসারীদের জন্যে করবে, অবশ্যই করবে। তাদের নিয়ে করবে না। রসুনের বাটি না পোড়ালে গন্ধ যায় না। কাম আর কাঞ্চন কলির মায়া।

॥ প্রবাহ ॥

ঠাকুরের পূতাস্থির পুরোটাই কয়েকজন গৃহী দখল করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু তাঁরাই ঠাকুরের সেবায় ব্যয়ভার বহন করতেন। তাঁরা চেয়েছিলেন কাশীপুর

উদ্যানবাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার সমাপ্তি ঘটুক। তাঁরা যুবক সন্ন্যাসী ভক্তদের বলেছিলেন—তোমরা যে যার বাড়ি ফিরে যাও, আর শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনীকে পাঠিয়ে দাও দেশে।

এই বিবাদ এক বিশ্রী পর্যায়ে পৌঁছেছিল। নরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ এবং মাস্টারমহাশয়ের কৌশলে ও ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের একমুখীতায় পূতাস্থি দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একভাগ পরিণত হল নরেন্দ্রনাথের আত্মারামের কৌটোয়, আর এক ভাগ চলে গেল জনৈক গৃহীর অহংকারের অধিকারে। তিনি চেয়েছিলেন তিনিই একটা মঠ গড়বেন—একটি মঠ। তিনি জানতেন না হাজার হাজার মন্দির একদা তৈরি হবে সারা বিশ্ব জুড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গার তিনটি ধারা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। গঙ্গার গৈরিক ধারাটি রইল নরেন্দ্রনাথের কাছে—বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস। যমুনার প্রেম গেল মা সারদার কাছে। আর সরস্বতীর চর্চা চলে এল কথামৃতকার শ্রীম-র অধিকারে।

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী একত্রিত—শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী হলেন না কেন?

কথামৃতকার শ্রীম লিখেছেন, 'ঠাকুর নিরাকারবাদী বটেন, কিন্তু আবার সাকারবাদী। ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেব-দেবী-প্রতিমার সম্মুখে ফুল-চন্দন দিয়া পূজা ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন। খাট-বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন। কিন্তু সংসার করেন না। ভাব সমস্ত সন্ন্যাসীর, তাই লোকে পরমহংস বলে।'

পরমহংস মানে, জীবন্মুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, নির্বিকার। ব্রহ্মানন্দে মগ্ন যোগীপুরুষ। হংস মান নির্লোভ মতি বা সন্ন্যাসী। 'অহং সঃ' আমিই সে, এই রকম ভাবনাযুক্ত হয়ে যিনি সংসার বন্ধন 'হনন' করেছেন। সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ, সংসার-বাসনা ত্যাগ। সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরচিন্তায় জীবনযাপন, ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে চতুরাশ্রমের একটি হল সন্ন্যাস। ভগবান মনুর ব্যবস্থা, ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। মানব প্রথমে ব্রহ্মচারী হবে, অর্থাৎ ছাত্রাবস্থা। দ্বিতীয় পর্বে গৃহী, তৃতীয় পর্বে বনী বা আরণ্যক, চরম পর্বে প্রব্রজ্যা, পুরোপুরি সন্ন্যাসী। পুরাকালের ভারতে একজন গৃহীর এই ছিল শাস্ত্রসম্মত উত্তরণ। সংসারী হও। ব্রহ্মচারী থেকে গৃহী। স্ত্রী গ্রহণ করো। সন্তানসন্ততি আসুক। তারপর বাণপ্রস্থী হয়ে যাও। নিজের থেকেই যথাসময়ে সসম্মানে নিজেকে সরিয়ে নাও। নিবৃত্তি মার্গে চলে এসো। ভোগের পর যোগ। শুরু হোক পরকালের পাথেয় সংগ্রহের কাজ। বুদ্ধদেব বললেন, 'ওকঃ' থেকে 'অনোকে' যাও। গৃহ থেকে গৃহহীন অবস্থায়। শঙ্কারাচার্য বললেন, সুরমন্দির-তরুমূল-নিবাসঃ। শয্যা ভূতলম্ অজিনং বাসঃ।। গৃহত্যাগ করে থাকবে কোথায়! দেব-দেউলে, তরুতলে, কিংবা গুহায়। থাকবে সম্পূর্ণ একা। গাছের বল্কল অথবা মৃগচর্ম ধারণ করবে। ভূতলে শয়ন। ভোগের প্রায়শ্চিত্ত। গৃহীদের দ্বারে দ্বারে যাবে। ভিক্ষা করবে। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু। চতুর্থাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাসে প্রবেশকালে, শিখা সূত্র ত্যাগ করে 'দণ্ড' ধারণ করতে হবে। তিনি হল দণ্ডী। দণ্ড হলেন সংযম ও জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানদণ্ডোধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে। ভগবান মনু ত্রিদণ্ডীর কথা বলে গেছেন। বাকদণ্ড, মনঃদণ্ড, কায়দণ্ড। দক্ষসংহিতায় এর ব্যাখ্যা আছে। বাক্যসংযম একটি দণ্ড, সৎকর্ম, দেবকর্ম দ্বিতীয় দণ্ড, তৃতীয় দণ্ডটি হল প্রাণায়াম।

ধর্মবিপ্লবী অবধূত নিত্যানন্দ এক কাণ্ড করেছিলেন। পুরীর পথে মহাপ্রভুর কাছ থেকে পাওয়া দণ্ডটি ভেঙে খণ্ড খণ্ড করে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বাঁকা দণ্ডটি ধারণ করলেই দণ্ডী হওয়া যায় না। আর এক মহাধর্ম-বিপ্লবী পরমহংস

শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁকে তাঁর ভৈরবীগুরু বলেছিলেন, 'নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব', শুধু বলেননি, দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে পণ্ডিতদের বিচারসভায় শাস্ত্রপ্রমাণাদির সহায়ে এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বারে বারে বলতেন, মন মুখ এক করো। ঈশ্বর তোমার মন দেখবেন। যেন বলতে চাইছেন, জার্সি পরে মাঠে নামলেই খেলোয়াড় হওয়া যায় না। পায়ের বল গোলে পাঠাতে হবে। কি সব বৈপ্লবিক কথাবার্তা তাঁর—সন্ন্যাসীর জীবন কঠিন কঠোর। কোন্ সন্ন্যাসী? বাণপ্রস্থী বুড়ো-হাবড়া নয়। যাঁরা জীবনের উষালগ্নেই বুঝে গেছেন, এ সংসার 'ধোঁকার টাটি'। 'সংসার কেমন? যেমন আমড়া—শাঁসের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল!' সুতরাং 'গুড় বাই সংসার।' ঈশ্বর আমাকে ফেলে দিয়েছেন, আমি ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াব। হাঁটতে হাঁটতে, তাঁর নাম গাইতে গাইতে ফিরে যাব। মানুষ সংস্কার নিয়ে আসে। দেখতে সব একই রকম; কিন্তু সংস্কার সব ভিন্ন। সংস্কারই মানুষকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়। দুটো দিক—একদিকে মায়ার মোড়কে মোড়া সংসার। বিপরীত দিকে মুক্তি। এদিকে কারাগার, ওদিকে প্রান্তর পড়ে আছে অনন্তের ছায়ায়। কোনও কোনও মানুষ জন্মেই বিপরীত দিকে হাঁটতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের 'ক্লাসিফিকেশান' করেছেন—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব আর নিত্যজীব। নিত্যজীব—যেমন নারদাদি—এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্যে—জীবদিগকে শিক্ষা দেবার জন্যে। বদ্ধজীব—বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষুজীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না। মুক্তি—বুদ্ধদেবের নির্বাণ, শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মজ্ঞান। শিবাদিষ্ট শঙ্করাচার্য বেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। এক ছাড়া দুই নেই। কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এই সংসার অতীব বিচিত্র। তোমার একমাত্র কাজ, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, নিত্যানিত্য বিচার, আর জপতপ করতে করতে সমাধিতে পৌঁছে যাওয়া। নির্বিশেষে ব্রহ্মই সত্য, আর সব অসত্য। সব ঝুট হ্যায়। তফাত যাও। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য বেদভূমিতে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসের মহিমা প্রচার করতে লাগলেন। সন্ন্যাসীর পথ শুষ্ক জ্ঞানের পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাস নিলেন গুরু তোতাপুরীর কাছে। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা মঠের পুরীনামা দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত অদ্বৈতবাদী নাগা সন্ন্যাসী। দীর্ঘ চল্লিশ বছর সাধনার পর নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। পুরী ও গঙ্গাসাগর তীর্থ করে ফেরার পথে তিনি ১৮৬৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৫৩ সালে, সতেরো বছর বয়সে দাদা রামকুমারের সঙ্গে কলকাতায় এলেন। রামকুমার ঝামাপুকুরে একটি চতুষ্পাঠী করেছিলেন। দাদার ইচ্ছা ভ্রাতা গদাধর টোলে সংস্কৃত

পাঠ করে পণ্ডিত হবে। বড়লোকের কলকাতার ঘরে ঘরে নানা বিগ্রহ। ব্রাহ্মণ সন্তান গদাধর শাস্ত্রীয় পূজাপদ্ধতি শিখে যজমানি করবে। দরিদ্র পরিবার দুটো পয়সার মুখ দেখবে।

অর্থ উপার্জনের জন্যে বিদ্যাশিক্ষা। 'চালকলা-বাঁধা বিদ্যা'! ঈশ্বরের অস্পষ্ট ছায়া আমি দেখতে পাই। আকাশের কালো মেঘে দেখতে পাই। শ্মশান-চিতায় দেখতে পাই। সবুজ ধানক্ষেতে বাতাসের তরঙ্গে দেখতে পাই। পায়ে চলা যে পথ দূর থেকে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেই পথে একাকী ঈশ্বরের পদচিহ্ন খুঁজে পাই। আমার আবেশ হয়। মাঝে মাঝেই আমি সংজ্ঞা হারাই। আমি কেমন করে অর্থের দাস হব। আমার সব কিছুই তো ঈশ্বরাধীন। ভগবান ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই। আমার অন্তরে অবিরত ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে, বিচ্ছেদ-বেদনার অশ্রু। আমার ভেতরে আমি এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পাই—গৈরিক বসন, পবিত্র অগ্নি, ভিক্ষালব্ধ ভোজন, নিঃসঙ্গ বিচরণ। সাধুদের মুখে শুনেছি কুটীচক, বহূদক, হংস এবং পরমহংস এই চারপ্রকারের পরিব্রাজক আছেন।

লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে সাধুরা একটানা কয়েকদিন থাকতেন। কখনও, কখনও। গদাধরের বয়েস তখন আট। একদল সাধু এসে বেশ কয়েকদিন আছেন। গদাধর নানাভাবে তাঁদের সেবা করছেন। কখনও সংগ্রহ করে আনছেন কাঠ, কখনও খাবার জল। গদাধর কোনদিন বিভূতিভূষিত হয়ে, কোনদিন তিলক ধারণ করে, কোনদিন নিজের পরিধেয় কাপড় ছিঁড়ে সাধুদের মতো কৌপিন আর বহির্বাস ধারণ করে বাড়ি ফিরছেন। মাকে আনন্দ করে বলছেন, মা, সাধুরা আমাকে কেমন সাজিয়ে দিয়েছেন দ্যাখো।

প্রায়ই এই ব্যাপার ঘটতে দেখে মা চন্দ্রাদেবী ভয় পেলেন। একদিন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, সাধুরা যদি একদিন তোকে নিয়ে চলে যায়! গদাধর বললেন, মা, আমি সাধুদের কাছে আর যাব না। আমি শুধু বলে আসি, তোমাদের কাছে আমার আর আসা হবে না।

সবে এক বছর হল, পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়েছে। বালক পিতাকে যখন বুঝতে শুরু করেছে ঠিক সেইসময় ক্ষুদিরাম জগৎ ছেড়ে চলে গেলেন। স্বামী সারদানন্দ গদাধরের সেই সময়কার মনের অবস্থা বর্ণনা করছেন, অনুমান করছেন, 'বুদ্ধির উন্মেষের সহিত কৈশোরে উপস্থিত হইয়া সেই শিশু যখন পিতার অমূল্য ভালোবাসার দিন দিন পরিচয় লাভ করিতে থাকে, স্নেহময়ী জননী তাহার যে সকল অভাব পূর্ণ করিতে অসমর্থ, পিতার দ্বারা সেই সকল অভাব মোচিত হইয়া তাহার হৃদয় যখন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে, সে সময়ে পিতৃবিয়োগ উপস্থিত হইলে তাহার জীবনে অভাববোধের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু তাহার হৃদয় ও বুদ্ধি এই বয়সেই অন্যাপেক্ষা অধিক পরিপক্ক হওয়ায় মাতার দিকে

চাহিয়া সে উহা বাহিরে কখনও প্রকাশ করিত না।

মায়ের কাছে, আরও কাছে জাগতিক ব্যথা-বেদনা বুকে চেপে সরতে সরতে তিনি এমন বস্তু লাভ করলেন, যা সাধুদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। যে ঘরে বসে ঈশ্বর রূপ-অরূপের খেলা করছেন, সে ঘরের চাবিটি তিনি পেয়ে গেলেন। এদিকের জানলা খুললে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর। শ্রীহরি ধ্যানে বসেছেন। ঋষিরা তপোবনে বেদ গাইছেন, যজ্ঞধূমে বনস্থলী আচ্ছন্ন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধ করছেন। তমালতলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। ওদিককার জানলা খুললে, ঝিম ঝিম অনন্ত।

সন্ন্যাসীর সাজে সাজলেন কিন্তু সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করা হল না; কারণ মা। মায়ের চোখে জল ঝরিয়ে বৈরাগ্যের আনন্দ পেতে চান না। এমন ত্যাগী সন্ন্যাসী কে কোথায় দেখেছেন, যিনি মায়ের জন্যে সন্ন্যাসও ত্যাগ করতে পারেন। মহাপ্রভু পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়হীন শুকনো সন্ন্যাসী হতে চাননি। এক নতুন ধারার সাধন-পথ বেরোবে যে! দেবালয়ের দরজা বন্ধ করে, বনকণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে হিমপর্বতের শূন্য উত্তাপে কম্পিত হতে হতে ব্রহ্মলাভে আমার বাসনা নেই। আমি মায়ের কোলে বসে ব্রহ্মলাভ করব। নির্বিকল্প সমাধি। ভগবান কি কেবল সন্ন্যাসীর! গৃহীরা শোনো—'পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাখা—এ সব তাতে দোষ নাই। এ সব শুধু ত্যাগ করলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ। মাঝে মাঝে নির্জনে যাও। সাধন-ভজন করো। ভক্তি আসুক। মনে ত্যাগ করো। সন্ন্যাসীরা বাহিরের ত্যাগ, মনে ত্যাগ দুই-ই করবে। ঈশ্বরলাভের পর চতুর্দোলায় চাপলে হবে না। লোকশিক্ষার জন্যে নেমে আসতে হবে জনজীবনে। বেদান্তের নিত্যানিত্য বিচারটিই হবে গৃহীদের আসক্তিনাশের অস্ত্র। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্যবস্তু। সংসার অনিত্য। আজ যা আছে কাল তা নেই। বুদ্ধদেবের কাছ থেকে নিয়ে নিলেন 'মৃত্যু-শরণ হওয়া'। রোজ সকালে উঠে একবার ভেবে নেবে, পৃথিবীতে আজই তোমার শেষ দিন নয় তো! তাহলে অহংকারের টংকার মৃদু হয়ে আসবে। বিষয়ের মুঠি আলগা হয়ে আসবে। মহাপ্রভুর কাছ থেকে প্রেম নিলেন, নামে রুচি জীবে দয়া। মহম্মদের কাছ থেকে নিলেন অর্গানাইজেশান। খ্রিস্টের কাছ থেকে নিলেন সাফারিং। সমস্ত মতের সাধনা যাঁকে করতে হবে, তিনি কি করে একটি সাধনধারার কট্টর সন্ন্যাসী হবেন! হাতে চিমটে, পরনে গেরুয়া, সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থমণ্ডল পরিক্রমা করছেন, তাহলে কি সর্বনাশটাই না হত আমাদের।

কুমিরে না ধরলে শঙ্করাচার্যও কি সন্ন্যাসী হতেন। তিনিও মাতৃভক্ত। সংক্ষিপ্ত পরমায়ু। জ্যোতিষীর অভ্রান্ত গণনা। মা তাঁকে কিছুতেই সন্ন্যাসী হওয়ার অনুমতি দেবেন না। বুকে আঁকড়ে রাখবেন। মায়ের অনুমতি ছাড়া শঙ্কর সন্ন্যাসী হতে পারছেন না। অথচ গেরুয়া বৈরাগ্যের নিশান তুলে রেখেছে।

একদিন মায়ের সঙ্গে নদীতে স্নানে গেছেন, এমন সময় কুমিরে শঙ্করের পা কামড়ে ধরল। বাঁচাও বাঁচাও। অন্য স্নানার্থিরা ছুটে এসেছেন। মা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীষণ টানাটানি। কুমিরের কামড় থেকে ছেলেকে বের করে আনা সহজ নয়। অবধারিত মৃত্যু। শঙ্কর তখন মাকে বললেন, মা! আমার মৃত্যু আসন্ন, তুমি এখনো আমাকে সন্ন্যাসী হওয়ার অনুমতি দাও, তাহলে আমি মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করি। মা অনুমতি দিলেন। কুমির টানতে টানতে আরও জলের দিকে নিয়ে চলেছে, আর শঙ্করাচার্য মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করছেন। ইতিমধ্যে কলরব শুনে একজন ধীবর ছুটে এসেছেন। কুমির শিকারে তাঁরা অভিজ্ঞ।

তাঁরা এসেই কুমিরটাকে জালে জড়িয়ে ফেললেন। কুমির ভয়ে শিকার ছেড়ে দিল। বৈদ্যরা এসে শঙ্কারাচার্যের ক্ষত-বিক্ষত পা সুস্থ করে তুললেন। শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসী হলেন। আচার্য শঙ্কর। ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ লিখছেন, 'বিশ্ব সভ্যতার বিস্ময় 'শঙ্করঃ শঙ্কর সাক্ষাৎ' শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য। বৌদ্ধ বিপ্লাবনের পর সনাতন বৈদিক ধর্মকে অসাধারণ মনীষা এবং অনন্যসাধারণ কর্মনিষ্ঠার দ্বারা তিনি পুনঃসঞ্জীবিত করেন। পারস্য হতে মহাচীন এবং কেদারনাথ হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পদব্রজে রাজশক্তি এবং ধনশক্তির বিনা আনুকূল্যেই ধর্মাভিযান করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিশাল অদ্বৈতসাম্রাজ্য। ৩ বৎসর বয়সে মাতৃভাষায় পরিণত জ্ঞান। ৫ বৎসর বয়সে উপনয়ন ও গুরুগৃহে গমন। ৭ বৎসর বয়সে অধ্যাপনা, ৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ, ১২ বৎসর বয়সে বেদান্তভাষ্য রচনা, ১৬ বৎসর বয়সে দুরূহ গ্রন্থাদি রচনান্তে বৃহত্তর ভারতে ধর্মাভিযানান্তে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিনি লীলা সংবরণ করেন।

বেদান্তের সঙ্গে প্রেম। তুমি অনন্ত, তুমি অরূপ; কিন্তু আমি তোমাকে পূজা করে পরমানন্দ লাভ করব। অদ্বৈত, অর্থাৎ 'নো টু'—দ্বিতীয় নাস্তি। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের তিনশো তেত্রিশ বছর পরে আর এক মহাসাধকের আবির্ভাব হল—আচার্য রামানুজ। তিনি বেদান্তের কোলে ভক্তিকে বসালেন। দাস আমি, ভক্ত আমি। জ্ঞানের অহঙ্কারে 'আমি' মরে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি' যখন যাওয়ার নয়, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। কলিতে নারদীয় ভক্তি। রামানুজের 'বিশিষ্ঠদৈতবাদ' তাঁর মনে ধরল। যুগের নাম যখন সন্দেহবাদ, তখন কৌশল করে মানুষকে ঈশ্বরমুখী করতে হবে। মানুষকে ভালো না বাসতে পারলে মানুষ তোমার শিক্ষা গ্রহণ করবে কেন? আমি সন্ন্যাসী, তোমরা গৃহী, মাঝে গেরুয়ার ব্যবধান। আমি প্রণাম আর প্রণামী নিতে এসেছি। তোমাদের দুঃখসুখের ভাগীদার হব কেন? পৃথিবীর এই বন্ধনের মাঝে আমি মুক্তির সাধনা করছি। আমি মুক্ত তুমি বদ্ধ—এই ভেদের মাঝে অদ্বৈতবাদ কোথায়। শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত হল ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য। এসো একটা

'হিউম্যান পিরামিড' তৈরি করি। মানুষই যার বিল্ডিং ব্লক। এসো মানুষের দেবতা নয় মানুষ দেবতাকে পূজা করি। তোমাদের স্বামী বিবেকানন্দ, আমার নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে বলাই আমার 'মটো'—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।' ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়বেন কেন? সাধন জগতের 'টাইফুন'। ধর্মের শেষ কথাটি যিনি দেবভাষায় নয়, কথ্যভাষায় বলতে এসেছিলেন। প্রথমে করা তারপরে বলা, তারপরে করান, ধরান। একালের ভাষায় 'ওয়ার্কশপ'। মা সারদা যেমন বলতেন—তোমাদের ঠাকুর ছাঁচ ভেঙে নতুন মানুষ তৈরি করে দিতে পারতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তির কোলে বেদান্তকে বসাবেন। মাকে পাশে রেখে তিন দিনের জন্যে সন্ন্যাসী হবেন। হতেই হবে। ভারতের পরিচয় গৈরিকে। ভারত ত্যাগভূমি। শ্রেষ্ঠ ধর্ম—সন্ন্যাসধর্ম। গর্ভধারিণী মা কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। জাহ্নবীকূলে জীবন শেষ করার বাসনা। শেষের কটা তিনি গদাধর তীর্থে কাটাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধন শেষ। বাৎসল্য আর মধুরভাব সাধন শেষ। সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখছেন। সব সত্য। দেব দেবীর মূর্তি, ইট-কাঠ-পাথর, খড়কুটো, কীট-পতঙ্গ, মানুষ সব, ঈশ্বরের চৈতন্য ভারে আছে। 'রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে/আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হয়ে।' শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা তখন—'মা তুমি ব্রহ্ম, মা তুমি ধর্মাধর্ম।' সাধনপথে এগোতে এগোতে হঠাৎ খুলে ফেলেছেন রহস্যের ঢাকনা। সত্যের মুখ দেখতে পেয়েছেন। দেখতে পেয়েছেন নিত্যকে, অনিত্যের পোশাক পরে বসে আছেন।

সন্ন্যাসীগুরু ল্যাংটা তোতাপুরী এসে গেলেন শেষ সাধন করাতে। বললেন, উত্তম অধিকারী তুমি। বেদান্ত সাধন করবে? অরূপে যাবে? অনন্তে মিশবে? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, দাঁড়াও, মাকে জিজ্ঞেস করে আসি। কি করব না করব, সব আমার মা জানেন। আদেশ নিয়ে আসি। তোতাপুরী ভেবেছিলেন, গর্ভধারিণী মা। যখন বুঝতে পারলেন মন্দিরের পাষাণী, একটু ব্যঙ্গের হাসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, মায়ের অনুমতি পেয়েছি, কিন্তু আমার গর্ভধারিণী ওই কুঠিতে। আমাকে তুমি গোপনে সন্ন্যাস দাও। গর্ভধারিণীকে ব্যথা দিতে পারব না। তোতা বললেন, কোই বাত নেহি। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, আউর এক বাত, আমি বিবাহিত। তোতা বললেন, সে তোমার পরীক্ষা। তোমার সংযমের, ইন্দ্রিয় শাসনের পরীক্ষা।

এক ঊষায়, সংগোপনে, সাধনকুটিরের নিভৃতিতে সন্ন্যাসের আয়োজন। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য সেই বর্ণনা, শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী হচ্ছেন—বিরজা হোম-প্রোজ্জ্বল হোমাগ্নির সামনে গুরু-শিষ্য মুখোমুখি দণ্ডায়মান—আহুতির

পর আহুতি, 'আমি আমার পিতা-মাতা-কলত্র সবাইকে ত্যাগ করলাম—ওঁ অগ্নায় স্বাহা। এতদিন যা কিছু জেনেছি, যা কিছু শিখেছি, সব ত্যাগ করলাম, ওঁ অগ্নায় স্বাহা। আমার চিন্তা ভাবনা অনুভূতি সব ত্যাগ করলাম। অগ্নি তুমি সাক্ষী, বৃক্ষরাজি তোমরা সাক্ষী, আকাশ তুমি সাক্ষী, আমার গুরু সাক্ষী, আমি আমার সমস্ত পার্থিবতা, আমার অহংকে এই পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন দিলাম। দেশ-কাল অতিক্রম করে আমার জীবাত্মা বিস্তার লাভ করুক, মিলিয়ে যাক মহাকাশের দিগন্তে। ঈশ্বর ছাড়া কোথাও তার বন্ধন না ঘটুক। হে কৃশানু, আমাকে দাহ করো, সমগ্র ঐহিক সত্তাকে ভস্মসাৎ করো। এই নাও পিতা-মাতার দেওয়া নাম, গদাধর চট্টোপাধ্যায়—ওঁ অগ্নায় স্বাহা! আমিই ঈশ্বর, অনন্ত আনন্দস্বরূপং, অনন্ত জ্ঞানং, শিবোহং।'

গুরুকে শিষ্য বলছেন, এইবার তাহলে চলো, তুমি দিলে এইবার আমি তোমাকে আমার গুরুদক্ষিণা দি, আমার মায়ের কাছে চলো। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করো। আমার মাকে মানো। বলো জয় মা! সীমার মাঝে অসীম তুমি নিত্য বাজাও যে সুর, সেই সুরে ভেসে যাও। এগারো মাস পরে তোতা ফিরে গেলেন—বেদান্তের কোলে ভক্তি নিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসীরূপ কোথায় গেল? কেন? ওই তো দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

www.boiRboi.blogspot.com

বিদ্যা ও ধর্ম

এই সেই বাড়ি? ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামতে নামতে ঠাকুর প্রশ্ন করলেন। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ তাঁকে অতি সাবধানে নামাচ্ছেন। ঠাকুর ভাবস্থ। শ্রাবণের বিকেল। আকাশে বাদুলে মেঘের আনাগোনা। দক্ষিণেশ্বর থেকে যখন বেরোলেন তখন কত আনন্দ! কত কথা! আমহার্স্ট স্টিটে পড়ামাত্রই ভাবান্তর। আত্মমগ্ন।

ইংরেজি স্টাইলের দোতলা একটি বাড়ি। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমদিকে সদর দরজা ও ফটক। কিছু কিছু ফুলগাছ এদিকে ওদিকে। বর্ষার ফুল ফুটে আছে। ঠাকুর ভেতরে প্রবেশ করলেন। ভক্ত পরিবৃত হয়ে বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে নিজের জামার বুকে হাত রাখলেন। তারপর বালকের সরলতায় মহেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁগো জামার বোতাম যে খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না তো?'

অপূর্ব ঠাকুরের সাজ। গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, তার আঁচলটা কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্নিশ করা চটি জুতো। মহেন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনি ওর জন্যে ভাববেন না। আপনার কিছুতে দোষ হবে না; আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।' বালকের মতোই নিশ্চিন্ত হলেন। ঈশ্বরের সরলতা।

সামনেই সিঁড়ি। ধাপে ধাপে উঠে গেছে সেই জ্ঞানলোকে। যেখানে বসে আছেন এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ঠাকুর তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। আড়ম্বরহীন পরিবেশ। তাঁর সামনের টেবিলে বাঁ হাতটি রেখে, ভারি মিষ্টি গলায় বললেন, 'আজ সাগরে এসে মিললাম।'

ঈশ্বরচন্দ্র সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের দুই বিদ্রোহী মুখোমুখি। মাঝখানে একটি টেবিলের ব্যবধান। ঠাকুরের মুখে স্বর্গীয় হাসি। একজন সমাজকে আর একজন ধর্মকে পথে আনতে চাইছেন। দুজনেরই সংগ্রাম, দারিদ্র্য আর অজ্ঞানের অন্ধকারের বিরুদ্ধে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিষ্কার বলে দিলেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' আর ঈশ্বরচন্দ্রের অকাতর দান, পরোপকার আর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জেহাদ। দুজনেই রসিক।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি, সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে রসিক বিদ্যাসাগরের প্রত্যুত্তর, 'তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান।'

দুজনেই হাসছেন। শ্রোতারা অপেক্ষা করে আছেন রসিক ঠাকুর কি উত্তর দেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অসাধারণ উত্তর, 'না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র।'

শ্রীরামকৃষ্ণ দুটি শব্দ প্রায়ই প্রয়োগ করতেন, বিদ্যা আর অবিদ্যা। প্রথমটা

'পজিটিভ', দ্বিতীয়টি 'নেগেটিভ'। ভালো আর খারাপ। আলো আর অন্ধকার। স্বাদু আর কটু। চাঁদের এপিঠ, চাঁদের ওপিঠ। আকাশে দু ধরনের তারা আছে। উজ্জ্বল আর অন্ধকার। কালো তারা, 'ব্ল্যাক হোল'। সব গ্রাস করে নেয়। আলো, সময়, বস্তু সব গিলে ফেলে। রাহু। বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার অসাধারণ এক দলিল। যেন প্লেটো আর সোক্রাতেস মিলিত হয়েছেন এক টেবিলে, বর্ষার বিকেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালো আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভালো-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।'

ঈশ্বরচন্দ্র ধর্মের জগতের মানুষ নন। মন্দিরের ধর্ম সম্পর্কে তাঁর তেমন কোনও আগ্রহ ছিল না। তিনি মানুষের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে উদারধর্ম স্বামী বিবেকানন্দের হাতে তুলে দেবেন, সেটি একলাইনের একটি শাস্ত্র, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। স্বামীজী যাকে আর একভাবে বলবেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। ঈশ্বরচন্দ্র গম্ভীর মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, উচ্ছ্বাসহীন নীরব সেবক। তিনি সেবা আর দয়ার মধ্যে কোনও পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করেন নি। মাতৃভক্ত। মায়ের জন্যে জীবন দিতে পারতেন। পরোপকার ও পরের দুঃখ দূর করার জন্যে সর্বস্ব দান করে গেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও স্বামীজীর মাঝখানে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কোমল প্রেমের পরত। এ-পাশে জ্ঞান, ও-পাশে জ্ঞান, মাঝে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস। তিনজনেই মাতৃভক্ত। মায়ের ভক্তই তো প্রকৃত শাক্ত।

জ্ঞানের সাগর, বিদ্যার সাগরের কাছে জ্ঞানের কথাই তো বলতে হবে। স্বামীজী বললেন, বেদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার পরমহংসদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের বাবা। ঠাকুর সাধারণের কাছে পরিষ্কার একটা সমাধান তুলে ধরেছেন। জগৎকে 'মায়া' বলে উড়িয়ে দিয়ে, 'নাকে নস্য ঠুসিয়া, টিকি নাড়িয়া, তর্ক করিয়া, পরিবারের সংখ্যা অবিরত বৃদ্ধি করিয়া 'সোহং' হুঙ্কার ছাড়িলে লোকে সিটি মারিবে'। ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য। সে কি রকম? একটি প্রদীপ জ্বলছে। আলো দেওয়াই তার কাজ। সেই আলোয় কে কি করছে, তা দেখা তার কাজ নয়। এ-ঘরে কেউ ভাগবত পড়ছে। আর এক ঘরে একজন দলিল জাল করছে। নির্বিকার প্রদীপ জ্বলছে।

'সূর্য শিষ্টের উপর আলা দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।'

'সাপের দাঁতে বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায় সাপের কিন্তু কিছু হয় না।'

'দেখো ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র ব্রহ্মই উচ্ছিষ্ট হয়নি, কারণ মুখে বলা যায় না।'

বিদ্যাসাগরমশাই আহা করে উঠলেন, 'একটা নতুন কথা শিখলুম আজকে।'

জীবন - পথ

যদি এমন একটি দৃশ্য-কল্পনা মনে আনা যায়—এক বন্ধু আর এক বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে পথ হাঁটছেন। দুই বন্ধুর বয়সের ব্যবধান অনেক। একজন তরুণ আর একজনের বয়সের গাছপাথর নেই। অতি প্রবীণ। তিনি এই পৃথিবীতে অনেক আগে এসেছেন। এই পৃথিবীর গাছপালা কীটপতঙ্গ, পরিবেশ, প্রাণীজীবন-এর চাল-চলন, ধরন-ধারন সবই জানেন। ইতিহাস জানেন বিজ্ঞান জানেন, পরা বিজ্ঞান, অপরা বিজ্ঞান, তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তিনি তরুণটির কাঁধে হাত রেখে পথ হাঁটছেন। এই পথচলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতটি কাঁধে রাখবেন। কানে কানে বলবেন, জীবনের পথ ধরে হাঁট বন্ধু। আমি তোমার পাশে আছি। আমি তোমাকে ঘিরে আছি। আমি তোমার বাইরে আছি, আমি তোমার ভেতরে আছি। কখনও আমি আর তুমি এক। 'সন্ন্যাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি'।

এই প্রবীণ বন্ধু কল্যাণপথের নির্দেশ দিতে পারেন, দিচ্ছেনও, সে-নির্দেশ পালিত হবে, কি হবে না, সেই জানে যাকে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সেই নির্দেশ না শুনে, না মেনে যারা বিপথে গিয়ে বিপদে পড়ে, তাকে তার এই প্রবীণ বন্ধু বলেন 'দেখলে তো, শুনলে না! তাই তোমার এই বিপদ হল!' আচ্ছা যা হয়েছে, হয়েছে। ওঠো, আবার চলো। আমি আছি। তোমার সঙ্গেই আছি!

একদিন হয়তো লজ্জা আসবে। আমার বেচালে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুটির কি দশা! কেন আমি তাঁর নির্দেশ তাঁর পরামর্শ মানছি না। এই লজ্জার নাম 'বিবেক'। ভগবান জীবের অন্তরে বিবেক হয়ে জেগে ওঠেন।

সাধুর ভগবান, জ্ঞানীর ভগবান, সাধারণ মানুষের ভগবান কি রকম। রকম? অবশ্যই নয়। সাধু জগৎ থেকে সরে গিয়ে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করেন। যদি তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—কিসের সন্ধানে চলেছেন আপনি? তিনি হয়তো বলবেন, আমি অপূর্ণ, পূর্ণ হতে চাই। অপূর্ণ কোন্ অর্থে? জ্ঞান! আমি অজ্ঞান। আমি আমরা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছি। তারা যেদিকে ছোটায় সেই দিকে ছুটি। প্রচুর আকাঙ্ক্ষা প্রবল বাসনা। নিজেকে বড় হীন মনে হয়। আমি আমার গৌরবের স্থলটি খুঁজে পেতে চাই। আতঙ্কের জগতে আমি আনন্দের জগতের অনুসন্ধান করছি। আর শুনেছি—সেই জগৎটি ভগবানের। সংসার যেন 'বিশালাক্ষীর দহ'! ঘুরপাক খাইয়ে গভীরে টেনে নিয়ে যায়। এটুকু বুঝেছি—সংসারে সারবস্তু কিছু নেই 'আমড়া, আঁটি আর চামড়া।' সেই কারণে,

আর কেন মন—এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে।
সেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।।
পক্ষ ভেদে ক্ষয় উদয়—নাইকো চাঁদের সে পুরে।
নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহরে।।

জ্ঞানীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার ঈশ্বর? তিনি বলবেন, অনন্ত তর্ক ও বিতর্ক। বহু রকমের জটিল শব্দ। তিনি সাকার না নিরাকার! তিনি দেহের আত্মা, না আত্মার দেহ, তাঁকে লাভ করতে হলে সংসার ছেড়ে গুহাবাসী হতে হবে? কোন্ নিয়মে সাধন করতে হবে? শিষ্য এইরকম প্রশ্ন করতে পাবেন গুরুকে,

কৃপয়া শ্রূয়তাংস্বামিন্! প্রশ্নোহয়ং ক্রিয়তে ময়া।
যদুত্তরমহং শ্রুত্বা কৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ।।
কো নাম বন্ধঃ কথশেষ, আগতঃ, কথং প্রতিষ্ঠাস্য কথং বিমোক্ষঃ।
কোহসাধনাত্মা পরমঃ ক আত্মা, তয়োর্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্।।

স্বামিন্! আমি যে প্রশ্ন করছি, কৃপা করে শুনুন, বন্ধন কাকে বলে, বন্ধন আসে কি ভাবে! কি ভাবে বেঁধে রাখে! কি ভাবে বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়! অনাত্মা কার নাম, পরমাত্মাই বা কি, আত্মা আর অনাত্মার বিচারই বা কিরূপ?

শঙ্করাচার্য উত্তর দিচ্ছেন। সেই বন্ধু আমাদের। বলছেন, অবিদ্যাবন্ধন উন্মোচন বা বিমোচন কর। শোনো, পিতৃঋণ বিমোচনের জন্যে পুত্রাদিরা আছে। শ্রাদ্ধাদি করে মুক্তির পথ করে দেবে; কিন্তু নিজের বন্ধন নিজেকেই খুলতে হবে। তারপর ধর তোমার মাথায় বোঝা, বইতে পারছ না, কেউ এসে তোমাকে সাহায্য করতে পারে; কিন্তু ধরো, তোমার খিদে পেয়েছে, জলতেষ্টা পেয়েছে, তখন তোমাকেই খেতে হবে, পান করতে হবে। অন্য কেউ খেলে হবে কি?

যে-রোগী পথ্য ও ঔষধ সেবা করে, তার পীড়া-আরোগ্য-রূপ সিদ্ধিলাভ হয়। যে তার বিপরীত আচরণ করে তার আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নেই। এইবার শ্রীশঙ্করাচার্য যা বললেন সেটি ধর্মপথের অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—

বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা, স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব, জ্ঞাতব্যমন্যৈরকাম্যতে কিম্॥

নিজের চোখ দিয়ে যেমন চাঁদের স্বরূপদর্শন লাভ হয়, অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা হতে পারে না, সেইরকম জ্ঞানচক্ষুদ্বারাই ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপদর্শন লাভ হয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হতে পারে না। একমাত্র জ্ঞান, শুধু শাস্ত্র চটকালে হয় না।

এরপর যদি অতিসাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করা হয়—ভগবান সম্পর্কে কি ধারণা? অধিকাংশ মানুষ বলবেন, অতশত জানি না, বিপদে পড়লে ডাক্তারকেও ডাকি, ভগবানকেও ডাকি। অভাবে পড়লে মন্দিরে গিয়ে পুজো চড়াই। যখন দুঃখ

আসে, প্রতারিত হই, যখন মৃত্যু এসে প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, যখন অপমানিত হই, বিতাড়িত হই, তখন বুঝতে পারি, 'যার কেহ নাই, তুমি আছ তার।'

কে এই তুমি? সঠিক ভাবে বলা যাবে না। একটা কথাই বলা যাবে—আমি নই। যেখানে আমি হাল পানি পাবে না, সেইখানেই 'তুমি'র আবির্ভাব।

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, চণ্ডী, অজস্র টীকা ও ভাষ্য ধর্মের জ্ঞানভাণ্ডার উপচে পড়ছে। মানুষ সম্ভ্রমে তার সামনে নত। গ্রহণের চেষ্টা আছে, কিন্তু জীবনে ফলিত করার চেষ্টায় অনেক বাধা। তার কারণ বেঁচে থাকার বহুতর সমস্যার সরাসরি সমাধান পাওয়া যাবে না। যেসব সমাধান আছে সেখানে, তা আয়ত্ত করা সহজ কাজ নয়। আমি বেঁচে থাকব; কিন্তু আমার 'আমি'টা 'তুমি' হয়ে যাবে। ওষুধ নয় অস্ত্রোপচার নয়, ঐকান্তিক ভাবনায় অলৌকিক এক 'ট্র্যানসপ্লান্ট'! বরং একথা সহজেই বোঝা যাবে—পথ দুটি—'প্রবৃত্তি' আর 'নিবৃত্তি'। প্রবৃত্তির পথ ধরে গেলে সংসার। ধর্মের কারণে সংসার তো শ্মশান হয়ে যেতে পারে না। 'মায়া' 'মায়া' বলে ঢাক বাজালে জগৎজোড়া সংসারের যত আয়োজন সব উবে যাবে এমনও নয়। মায়া এখন ঘোর মায়া। কত আলো! কত বৈচিত্র্য! কত ভোগের উপকরণ।

সংসার থেকে শ্মশান একটি পথ। শ্মশান শ্মশানই থাকবে। সংসার সংসার। সংসারকে শ্মশান করলে মানুষ আসবে কোথায়! রাজা যুধিষ্ঠিরের সংসার ছিল, শ্রীকৃষ্ণের ছিল, শ্রীরামচন্দ্রের ছিল, মহাপ্রভুর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল। রঘুবীর কোথায় এসে আসন পাতবেন? কোনও মন্দির আলো করবেন না ভবতারিণী! মন্দির নির্মাণের অর্থ আসবে কোথা থেকে। শ্রীশঙ্করাচার্যের চারটি ধাম নির্মাণের সহযোগিতা তো সংসারীকেই করতে হবে।

সংসারকে করতে হবে ধর্মের সংসার, শিবের সংসার। গৃহ আর গৃহীকে বাদ দিলে ধর্মের ভিত টলে যাবে। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াতে হবে সকলকেই। সেই স্থানটি বড় পবিত্র, বড় গৌরবের। ধর্মক্ষেত্রে-কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধা পাঠাবে সংসার। শ্রীকৃষ্ণ সংসার থেকে শ্মশানে টেনে নিয়ে গিয়ে অর্জুনকে জীবনের মন্ত্র দিলেন না। এমন এক পরিবেশে নিয়ে গেলেন যেখানে দাঁড়িয়ে তিনটি কালের প্রবাহকে মানসপটে প্রত্যক্ষ করা যায়। থাকা আর না-থাকা, অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের সংযোগস্থল। ধর্মকে ধারণ করতে হলে মৃত্যুর আগেই মৃত্যুকে এগিয়ে আনতে হবে। আর তখনই 'আমি'টা 'তুমি' হয়ে যাবে। অর্জুন ভয় পেয়েছেন। সামনে ত্রিকাল। বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছে। অতীত পড়ে আছে মহাসমারোহে ঘটনার জাল বুনে। অতীত রচনা করেছে বর্তমান। বর্তমানে রয়েছে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এ কেমন—বর্তমান একটা থালা, অতীত হল রান্নাঘর, পরিবেশিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ।

ইংরেজি একটি প্রবাদ—He that would know what shall be, must consider what has been.

অর্জুন বর্তমানটিকে সমর্পণ করে দিলেন ভগবানের হাতে। পরিস্থিতি ঘটনা অর্জুনকে শেখাতে চাইছে সেই অমোঘ সত্য—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

জীবাত্মাকে রথের রথী আর শরীরকে রথ বলে জেনো; বুদ্ধি হল সারথি আর মন হল বলগা।

উপনিষদের কাছে প্রার্থনা করি। গিরিশচন্দ্রের প্রশ্নটি তুলে ধরি—'কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন'। বুদ্ধদেব এই প্রশ্নের সমাধান দিচ্ছেন গিরিশ নাটকে—

নিত্য আমি—
নাহি জন্ম—নাহিক মরণ
নাহি নাম-ধাম, উপাধি রহিত।

উপনিষদ এই সিদ্ধান্তেই এনে ফেলবেন কয়েকধাপ বিশ্লেষণের পথে। প্রথমে বলবেন,

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষুগোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥

আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ হল অশ্ব, শরীর হল রথ। রূপ, রস, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেন সেই অশ্বগুলির রাজপথ। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মাই স্বয়ং ভোক্তা।

স্বাভাবিক প্রশ্ন—তাহলে কর্তা কে? দেহ, মন অথবা ইন্দ্রিয়। উপনিষদের উত্তর—দেহ, মন আর ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মাই কর্তা। ইনি আবার কোন্ আত্মা? 'জীব' বা 'জীবাত্মা'। প্রকৃত আত্মা হলেন 'পরমাত্মা' অথবা 'শুদ্ধ চৈতন্য'।

অতঃপর উপনিষদের কাছে প্রশ্ন পথের শেষ কোথাও আছে কি? না রবীন্দ্রনাথের মতো বলব—

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?
আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে।
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ-জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে॥
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।

পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যিক সুষমায় উপনিষদকেই প্রকাশ করছেন, 'ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে।' উপনিষদ পথের নির্দেশ দিচ্ছেন—পথের পরিচয়ও দিচ্ছেন,

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দূরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

উপযুক্ত আচার্যের শরণ নিতে হবে। তাঁরা পথের নির্দেশ দেবেন। পথ অতি দুর্গম। ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের ওপর দিয়ে চলা। আচার্য কৃপা করে সেই পথ দিয়েই নিয়ে যান আত্মস্বরূপে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখ্যাৎ প্রমুচ্যতে

মানুষের জীবনের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা। সঘোষে জানায় না—আমি শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, গন্ধহীন, শাশ্বত, অবিনাশী, অনাদি, অনন্ত, হিরণ্যগর্ভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, নিত্যবস্তু আত্মাকে জানতে চাই, প্রতিষ্ঠিত হতে চাই, কিন্তু প্রতিপদে তার স্বগতোক্তি থেকে বোঝা যায়, তার অন্বেষণ হল এমন কিছু যা সুন্দর, প্রেমময়, উজ্জ্বল, শান্ত, দান্ত, সৌম্য, শিব। মানুষ সংকীর্ণতা থেকে উদারতায় যেতে চায়, অন্ধকার থেকে আলোতে। উপনিষদ আরও এক কদম এগিয়ে দিতে চায়—বাইরে নয় ভেতরে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য মততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ॥ (কঠঃ ২/১/১২)

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ (ব্রহ্ম) দেহের অভ্যন্তরে বাস করেন। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সাধক যখন ব্রহ্মকে জানতে পারেন তখন তিনি নিজেকে আর গোপন করেন না। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। ধূমহীন এক অগ্নিশিখা জীবের হৃদয়ে। তিনি পুরুষ। এই পুরুষ কালাধীশ। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিয়ামক। ইনি সতত বিদ্যমান। সর্বত্র বিদ্যমান।

নচিকেতা যদি স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করতেন—জীবন ভাসতে ভাসতে যায় কোথায়, তাহলে অপূর্ব এই উত্তরটি পেতেন,

'একখানা মেঘ চাঁদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ভ্রমের উৎপত্তি হচ্ছে যে চাঁদটাই চলেছে। তেমনি প্রকৃতি, দেহ, জড়বস্তু—এইগুলি সচল গতিশীল; এদের গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে আত্মা গতিশীল। সুতরাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সহজাত জ্ঞান দ্বারা সর্বজাতির উচ্চনীচ সব রকমের লোক, মৃতব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছেই অনুভব করে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য।

'প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটা নক্ষত্রস্বরূপ, আর ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত নির্মল, নীল আকাশে এই নক্ষত্ররাজি বিন্যস্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্বই তিনি। কতকগুলি জীবাত্মারূপ তারকা—যাঁরা আমাদের দিগন্তের বাইরে চলে গেছেন, তাঁদের সন্ধানেই ধর্ম জিনিসটার আরম্ভ; আর এই অনুসন্ধান সমাপ্ত হল—যখন তাঁদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা আমাদের নিজেদেরও যখন তাঁর মধ্যে পেলাম।'

পথের শেষ কোথায়? আপাত সহজদৃষ্টিতে—মৃত্যুতে। থাকতে থাকতে না থাকায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি প্রত্যক্ষ দর্শন উল্লেখের প্রয়োজন আছে। স্বয়ং অবতার মথুরবাবুর হাত ধরেছিলেন। তাঁকে চালাচ্ছিলেন। মথুরবাবু যেদিন নশ্বর দেহ ত্যাগ করবেন সেদিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখতে পাঠালেন না। কালীঘাটে তাঁর দেহত্যাগের কয়েক ঘণ্টা আগে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গভীর ধ্যানমগ্ন হলেন। জ্যোতির্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ভক্ত মথুরের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন বিকেল পাঁচটা। ঠাকুরের কি অপূর্ব দর্শন! আত্মার এক লোক থেকে আর এক লোকে গমনের কি আয়োজন। দিব্যরথ এসেছে। ঠাকুর দেখছেন, 'শ্রীশ্রী জগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্যরথে তুলে নিলেন—তার তেজ শ্রীশ্রী দেবীলোকে গমন করল।' পরে ঠাকুর ভক্তদের বলছিলেন, পুণ্যলোকে গেলেও ওকে আবার আসতে হবে। ভোগবাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়নি।'

বৃদ্ধ মণিমোহন পুত্র শোকাতুর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'আহা! পুত্রশোকের মতো কি আর জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কিনা? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ—যতদিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে।' নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা তাঁকে বলছেন। নিজে তখন বিমর্ষ গম্ভীর। 'অক্ষয় মলো—তখন কিছু হল না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে, তলোয়ারের কিছু হল না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হল—খুব গান করলুম, নাচলুম, হাসলুম। তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল! তারপর এল শোক।'

প্রশ্ন হল জীবন-পথ কি দুটো। ধর্মের পথ, অধর্মের পথ? অবশ্যই নয়। তাহলে পথিক কে? স্বয়ং ভগবান! শৈশবের একটি দৃশ্য মনে আসছে, এক ফেরিঅলা, মাথায় তার ঝুড়ি, হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে—পুতুল নেবে, পুতুল! সেই ঝুড়ি থেকে মুখ বের করে আছে—বাঁদর, ভাল্লুক, শ্রীরামচন্দ্র, সংকীর্তনানন্দে মহাপ্রভু। গোরা সৈন্য। পেটমোটা ব্রাহ্মণ। লাঠিধারী সিপাই।

ভগবান মাথায় ঝুড়ি নিয়ে সৃষ্টির পথ ধরে হাঁটছেন। মাথায় ঝুড়ি। এই নাও, গাছে ছেড়ে দিলুম বাঁদর, চিরকাল ঝুলে থাক বানর বংশ। বনে ঢুকিয়ে দিলুম বাঘ, ছুটিয়ে দিলুম সুন্দরী হরিণ। আর সমস্যাটা তৈরি করে দিলুম চৈতন্যময় মানুষের বিভাগে—এই নাও রাম, রাবণও দিলুম। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে জগাইমাধাই। পাণ্ডবদের বিপক্ষে হাজির কৌরব। আবার শ্রীকৃষ্ণ উভয়কুলের সখা।

স্বামীজী ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম মিলনের দিনে অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর যে গানটি গেয়েছিলেন সেইটিতে এই পথের অতুলনীয় প্রকাশ আছে! মনে হয়, সব কথার শেষ কথা—

সত্যপথে মন করো আরোহণ
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে,
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব হরণ
পরম যতনে রাখ রে প্রহরি শম দম দুই জনে।।

09 FEB 2008

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন গুরু কোথায়? স্বামীজী বললেন, শিক্ষক কোথায়? অবশেষে দেখা গেল, গুরু আর শিক্ষক একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি জানতেন, সবাই সাধক কিংবা সন্ন্যাসী হতে পারবে না। ত্যাগের পথ বৈরাগ্যের পথ অতি কঠিন। ভেতরে সে-সুর না বাজলে বৃথাই ভেকধারী, ভণ্ড তপস্বী। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে বিজয়কৃষ্ণকে সাবধান করলেন—বিজয়! সাধু চিনতে ভুল করো না। সাধুর বগলে পোঁটলা-পুঁটলি দেখলে বুঝবে, সে সন্ন্যাসী নয়। সে ঈশ্বরের খোঁজে আদৌ ব্যস্ত নয়, সে ব্যস্ত ভাণ্ডারার খোঁজে। তার কথা হরি কথা নয়, অমুকবাবু কাল ক্যায়সা খিলায়া।

বিষয়-বৈরাগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—সে লক্ষজনে একজন; কিন্তু লক্ষ লক্ষ সংসারী মানুষের আদর্শ মানুষ হতে তো আপত্তি নেই! তেমন মানুষ তৈরি করতে হবে। সে মানুষ স্কুল-কলেজে হবে না। তেমন মানুষ তৈরির পদ্ধতি ভিন্ন।

দক্ষিণেশ্বরের সাধনভূমিতে উঠে দাঁড়ালেন শিব। বুকে-বাঁধা শক্তি মুক্তি পেলেন। রামকৃষ্ণরূপী শিব শক্তিকে মুক্ত করেছিলেন, পরাধীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বুকে। কে বারণ করবেন সেই অমিত শক্তিকে। 'কে আছে এমন, জীবন করিবে দান!'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে হলেন গাণ্ডিবধারী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের রথে। শক্তির বাণ আপতিত হল দক্ষিণেশ্বর হতে বহু দূরে জয়রামবাটীর এক কন্যার পরে। বালিকা। গ্রামীণ পরিবেশ। তুলোর ক্ষেতে মায়ের সঙ্গে তুলো আহরণ করে। দাওয়ায় বসে পৈতের সুতো কাটে তকলিতে। আমোদের স্নান করে। সমবয়সীদের সঙ্গে পুতুল খেলে। কিন্তু বালিকাটি অবশ্যই একটু অন্যরকম। যেন একটু গম্ভীর। চপলা নয়। বিবাদ করে না, বরং বিবাদ মিটিয়ে দেয়। পরিবারের আর্থিক অবস্থা, ধনীও নয়, দরিদ্র নয়, মোটামুটি দিন চলে যায়। সাধু হতে হলে, 'বিরজা হোমে' নাম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে নতুন পরিচয়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। আমার পিতা নেই, মাতা নেই, জাতি, কুল, শীল নেই। আমার সাংসারিক, সামাজিক সব পরিচয় দগ্ধ হল। আমার 'আমি' ছাই হল। এমন কি আমার ধর্মও নেই। আমি ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর ছাড়া এই দুনিয়ায় আমার কেউ নেই।

জয়রামবাটির সেই অলৌকিক কন্যাটির জীবনে এমনই একটি ঘটনা ঘটে গেল প্রথম শৈশবেই। কেউ তখন বোঝেননি তার তাৎপর্য। আত্মকথা বলতে গিয়ে সেই তুচ্ছ ঘটনাটি তিনি যখন বললেন, তখন যেন ইঙ্গিত করলেন, বুঝে

নাও, কার নির্দেশে এই জীবন চলছে। 'আমার মা আমার নাম রাখলেন ক্ষেমঙ্করী। আমি হবার আগে, আমার যে মাসিমা, তাঁর একটি মেয়ে হয়। সেই মেয়ে মারা যাবার পর আমি হই। মাসিমা আমার মাকে বললেন, 'দিদি, তোর মেয়ের নামটি বদলে সারদা রাখ্; তাহলে আমি মনে করব, আমার সারদাই তোর কাছে এসেছে আর আমি ওকে দেখেই ভুলে থাকব।' তাই তো আমার মা আমার নাম রাখলেন সারদা।'

ওই নাম শুধু মাসিমাকে নয় জগতের সমস্ত তাপিত মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে। তিনি বলবেন, 'আমি সকলের মা, পাতানো মা নয়, সত্যিকারের মা'। রচিত হবে অপূর্ব সেই প্রার্থনা, দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং, যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীং। তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং, দয়াস্বরূপাং, প্রণমামি নিত্যম্।। তুমি আনন্দময়ী, শরণাগতের বিপদবিনাশিনী। প্রথম ত্যাগ, নাম। ক্ষেমঙ্করী নয়, সারদা। কল্পনা আর কবিতা মাখা একটি নাম। পরবর্তীকালে যা বহু মানুষের বীজমন্ত্র হবে। মোক্ষের দুয়ার খুলে যাবে। জননী শ্যামাসুন্দরী সাশ্রুনয়নে বলবেন, 'তোকেই যেন আবার আমি পাই মা।' আর তাঁর ভাই বলবেন, 'দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে দিদি কি না করেছেন! ধান ভানা, পৈতা কাটা, গরুর জাবনা দেওয়া, রান্না-বান্না বলতে গেলে সংসারের বেশি কাজই তো দিদি করেছেন।'

কোথায় সেই অবাক অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে এক বিচিত্র পাঠশালা খুলে বসে আছেন। মানুষের জীবনের একটি বড় অঙ্গ হল ধর্ম। বিরাট একটা প্রশ্ন। দেহধারী এই অপরূপ প্রাণীটি জগৎ-সংসারে জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল, সবাই বলছে, ভগবান জানেন, ভগবান আছেন, ভগবান দেখবেন, ভগবান রক্ষা করবেন। কোথায় সেই অলৌকিক, সর্বাচ্ছন্নকারী পরমপুরুষ। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ভাগবত। ভজন, সাধন। তিনিই নিত্য, আর সব অনিত্য। এ কি সব কথার কথা! না, সার কথা! মানুষ ভগবানকে ভয়ে ডাকে, না আপন জ্ঞানে ভক্তিতে ডাকে? সে ডাকে তিনি কি সাড়া দেন? ঈশ্বর-লাভের অর্থ কি? ধন, দৌলত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। জ্ঞানীর বিশ্লেষণে তিনি সাড়া দেন, অথবা ভক্তের সকরুণ ডাকে! কি নামে তাঁকে ডাকা যায়, গড, আল্লা, ভগবান! কোন্ শাস্ত্র ধরে এগোতে হয়?

শুরু হল পূজারীর নিবিড় সাধনা। অরণ্যে, কি পর্বত গুহায়, কি মরু-প্রান্তরে যেতে হল না। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণ রূপান্তরিত হল তপোভূমিতে। সাধনার ইতিহাসে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। সব উলটে গেল। সাধারণত এই হয়, আগে গুরুকরণ, তারপর সাধন, তারপর ইষ্টদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে হল বিপরীত। আগে দর্শন, তারপর একের-পর-এক গুরুর আগমন, শাস্ত্র ধরে বিভিন্ন সাধন।

দর্শন আগেই হয়ে গেছে! রহস্য উন্মোচিত। লক্ষ্য স্থির। সংশয়ের অবসান। পরের সাধন শুধু পথের যাচাই। সব নদীই কি সমুদ্রে যাচ্ছে? সব রুচিরই কি শেষ আস্বাদন সেই পরমকারণ? সব পথ ধরে এগিয়ে সেই একই প্রাপ্তি। এখন প্রত্যয় সহকারে বলা যেতে পারে কি—'যত মত তত পথ'—অবশ্যই।

রত্নভাণ্ডার পাওয়া হয়ে গেছে। সাধন সাগর মন্থনের ফলে অমৃতের কলস উঠেছে, এখন ভাগ করে নেওয়ার পালা। এ যে অশেষ ভাণ্ডার! নিঃশেষ হবে না কোনদিন। অনন্তের অন্ত পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যাঁকে পেয়েছেন, তিনি নারী। তিনি মা। এই মায়ের শরীর চাই যে! রাসমণি যাঁকে পাথরে বেঁধেছেন, তাঁকে যে এইবার জীবন্ত নারী শরীরে বাঁধাই করতে হবে। আধার চাই। আধারভূতা।

জয়রামবাটীর প্রান্তরে একাকিনী বালিকা। নিষ্পাপ এক প্রাণ। মেয়েটি একেবারে অন্যরকম। খুব সাদাসিধে, ভীষণ সরল। গ্রামে জগদ্ধাত্রী পুজো। সারদা মায়ের সামনে বসে ধ্যান করছেন। হলদে পুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল প্রতিমাদর্শনে এসেছেন। তিনি দেখছেন, দুই জগদ্ধাত্রী মুখোমুখি। সারদাও জগদ্ধাত্রী হয়ে গেছেন। মৃন্ময়ী সামনে চিন্ময়ী। ঘোষালমশাই ভয় পেয়ে গেছেন। তিনি পালিয়ে গেলেন!

গরুড় পক্ষীর মতো শ্রীরামকৃষ্ণ ঠোঁটে করে তুলে আনলেন সারদাকে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী যে আধারে সমাবিষ্ট। যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদা চ শোভনা/আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী। কিছুদিন পরেই যে-মানবযজ্ঞ শুরু হবে সেই যজ্ঞের যজ্ঞলক্ষ্মী হবেন মা সারদা। নৃসিংহরূপী ব্রহ্মের প্রকাশাত্মিকা শক্তিই মহালক্ষ্মী—ইনি ভুরাদি ব্যাহৃতিযুক্তা প্রণববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, পরমার্থবিষয়া।

ঘোষালমশাই সারদা শরীরে জগদ্ধাত্রী দর্শন করে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। দেবী দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী অভিন্ন। পার্বতীরই অপর নাম জগদ্ধাত্রী। সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে। তুমি দয়ারূপা। সারদা মাতা তুমি দয়ারূপা, তোমার দৃষ্টি করুণা ভরা, দয়াতে তোমার হৃদয় নিত্য দ্রবীভূত, তুমি জীবের দুঃখ মোচন কর, বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং/বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং।

'হ্যাঁ, তুমি আমার শক্তি'। শ্রীরামকৃষ্ণ জনৈকা মহিলা ভক্তকে বললেন, 'ও কি যে সে! ও আমার শক্তি। জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী।' ভাগিনেয় হৃদয়কে একদিন সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'একে (নিজেকে দেখিয়ে) তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনও কটু কথা বলিসনি। এর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস, কিন্তু ওর ভেতর যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।'

স্বামীজী আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, একটি চিঠিতে লিখলেন, 'দাদা, জ্যান্ত দুর্গাপূজা দেখাব, তবে আমার নাম। মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ওই যে বলেছি, ওখানেই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিয়ো।'

ভক্তির আতিশয্যে মানুষ পাথরের টুকরোকে শালগ্রাম বলে সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করতে পারে, ভোগ লাগাতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার, তাঁর সহধর্মিণী, সুতরাং পূজনীয়া। শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেক পরীক্ষায় পাশ করতে হয়েছিল। মা সারদা বলেছিলেন, ঠাকুরকে 'বিরে' নিয়েছিল। অর্থাৎ পরীক্ষা করে নিয়েছিল। 'কো রামকৃষ্ণ'! রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে পরীক্ষা করিয়েছিলেন, সত্যই কামজয়ী কিনা। মথুরবাবু কায়দা করে মেছুয়াবাজারে বাইজী বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে সমাধিস্থ ঠাকুরের চোখের মণিতে আঙুল ঠেকিয়ে সন্দেহবাদীরা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল, ঢং না প্রকৃত সমাধি! সব চেয়ে বেশি পরীক্ষা করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। বিছানার তলায় লুকিয়ে টাকা রেখেছিলেন। টাকার স্পর্শে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর ঝন্‌ঝন্‌ করত। হাতের আঙুল বেঁকে যেত। বিছানায় বসামাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ উঃ বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন। সমাধিস্থ ঠাকুরকে গরম কল্কের ছ্যাঁকা দিতে চেয়েছিলেন। শেষ শয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের রোগযন্ত্রণা। পাশে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ, ভাবছেন এখন যদি বলতে পারেন, আমি অবতার! শ্রীরামকৃষ্ণের রোগক্লিষ্ট ঠোঁটে হাসির রেখা। অস্ফুটে বললেন, এখনও অবিশ্বাস!

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই দুজনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রহণযোগ্যকেই মানুষ গ্রহণ করে। কাঁচকে হীরে বলে চালানো যেতে পারে। পাকা জহুরী ধরে ফেলবে। কাল সেই জহুরী। ঠাকুর ভক্তদের প্রায়ই সাবধান করতেন, 'সাধুকে দিনে দেখবি। রাতে দেখবি। বাজিয়ে নিবি। হাঁড়ি কেনার সময় টংটং করে বাজিয়ে নিতে হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকেই নিজে বাজাতে চাইলেন। তিনি 'মা' তৈরি করতে চাইছেন। যাঁর একটি দুটি নয় হাজার হাজার সন্তান হবে। তাদের মধ্যে একটি সন্তান তিনি স্বয়ং!

তোতাপুরীর কাছে যখন সন্ন্যাস নিলেন, তখন সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, আমি যে বিবাহিত! গুরু তোতাপুরী বললেন, বহুত আচ্ছা! হাতেনাতে পরীক্ষা হবে তোমার, ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পার কিনা! ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে কি না!

শ্রীমা একাদিক্রমে আটমাস ঠাকুরের সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করেছিলেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ এই বললেন, "ও যদি এত ভালো না হত, আত্মহারা হয়ে আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কিনা কে বলতে পারে? বিয়ের পরে 'মা'কে ব্যাকুল হয়ে বলেছিলাম, 'মা, আমার পত্নীর

ভেতর থেকে কামভাব এক কালে দূর করে দে।' ওর সঙ্গে একত্রে বাস করে এই কালে বুঝেছিলাম, মা সে-কথা সত্যসত্য শুনেছিলেন।''

এই দিব্য-সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণ! শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করেছিলেন শ্রীমাকে, 'তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?' শ্রীমা-র দৃঢ় উত্তর, 'তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করতেই এসেছি।' অর্থাৎ তুমি গুরু, আমি তোমার শিষ্য। এতকাল পুরুষের সাধনজগতে নারী ছিলেন ব্রাত্য। বড় বড় সাধকরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এইটিই বলতে চাইতেন, নারী নরকের দ্বার। নারীর এত বড় অবমাননা আর কি হতে পারে! বেদে অধিকার নেই, চণ্ডীপাঠের অধিকার নেই, শালগ্রাম স্পর্শ করার অধিকার নেই! নারী কি তাহলে শুধুমাত্র পুরুষের ভোগ্যপণ্য, দাসী, বাঁদী, গণিকা, সন্তানের জন্মদানের যন্ত্র! এ কি কথা? তোমরা 'মা' বলে ডাক কোন্ আক্কেলে! দেবীমূর্তির পূজা করো! গরম গরম মন্ত্র পড়, অথচ জীবন্ত রমণীকে দেখ কামনার দৃষ্টি নিয়ে! দিকে দিকে চণ্ডীপাঠ! লক্ষবার বলছ—স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু—সব রমণীই মাতৃরূপা, অথচ কাজে করছ কি? সংসারের হাঁড়িকাঠে বলি দিচ্ছ!

শ্রীরামকৃষ্ণ এক বিপ্লবী! ঠাকুর আর মা অদ্ভুত এক টিম। ধর্মের জগতে শক্তিশালী এক বিস্ফোরণ! গীতার মানে জান? পর পর গীতা গীতা গীতা বলে যাও। কি শুনবে? তাগী, তাগী। অর্থাৎ ত্যাগী। শাস্ত্র তাকে তুলে রাখার জন্যে নয়। ধর্ম ধারণ করার জিনিস। জীবন থেকে পালানো নয়, ছুঁচের ফোঁড়ের মতো জীবনে জীবন গাঁথা। ধর্ম ইয়ারকির জিনিস নয়। রঙের গামলা। তুমি যে-রঙ চাও, সেই রঙে নিজেকে ছুপিয়ে নাও। ধর্মের জন্যে আলাদা কোনও পোশাক নেই। লুঙ্গি, হ্যাট-কোট, ধুতি-পাঞ্জাবি, কৌপীন সবই চলতে পারে। চোখ উলটে, দম বন্ধ করে, ডিগবাজি খেয়ে ঈশ্বরকে ডাকার দরকার নেই। আগে বিশ্বাস, তারপর 'মা' বলে ডাকা। 'বাবাও' বলতে পার। 'দাদা'ও বলতে পার। তবে সম্পর্কটা যেন পাকা হয়। আসল কথা মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখ। দয়ার মনোবৃত্তি নয়, সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। গুরুগিরি আর বেশ্যাগিরি এক। মানুষের গুরু একজন, তিনি পরমেশ্বর।

বিদায়ের আগে রোগশয্যায় শুয়ে স্ত্রীর সঙ্গে শেষ কথা, পারবে না তুমি? পারবে না? অন্ধকারে যারা পোকার মতো কিলবিল করছে তাদের আলোয় আনতে পারবে না? আমি কি করেছি, তোমাকে আরও, আরও, আরও করতে হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ছাড়াই জয়রামবাটীর লক্ষ্মী, সারদা হলেন নেত্রী। আমাদের মা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শক্তির জন্যে ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ কি দিয়ে গেলেন, 'তুমি কামারপুকুরে থাকবে—শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।'

দুঃখের, দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে বেরিয়ে এলেন সেই মা। জাতিভেদ মানেন না। সংস্কার মানেন কুসংস্কার মানেন না। নীচতা সহ্য করতে পারেন না। দেহ দৈহিক কষ্ট ভ্রূক্ষেপ করেন না। উদার মনোভাব। অসীম সাহস। তেলেভেলোর প্রান্তরে একাকী এই রমণী ডাকাত-দম্পতির হৃদয় হরণ করলেন। হরণ করতে এসে চিরকালের জন্যে হৃত হল দস্যু-দম্পতি। ভক্ষক হল রক্ষক। লাঠি হাতে মেয়েটিকে আগলে আগলে নিয়ে এল তারকেশ্বরের চটি পর্যন্ত। বিদায়মুহূর্তে পাষাণের চোখে জল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, আমার অনেক বিচার ছিল, তোমার কোনও বিচার থাকবে না। ভক্তের যেমন জাত নেই, সন্তানেরও সেইরকম জাত নেই। ভালোয়-মন্দয় মেশানো এই পৃথিবী। সব রকমের পাওনা হাসি-মুখে বুঝে নিতে হবে। শ, ষ, স—সহ্য করো সহ্য করো, সহ্য করো। যে সয় সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন আর যখন যেমন তখন তেমন।

তাঁর গ্রামের বাড়িতে মা যখন থাকতেন দেখলে বোঝার উপায় ছিল না তাঁর প্রকৃত স্বরূপ। একেবারেই সাধারণ। শান্ত। মহাসমুদ্রের মতো। কল্লোল হিল্লোল নেই। উপদেশ দিতেন না, ধমকাতেন না, রাগ করতেন না। শুধু কাজ করতেন, কর্তব্য পালন করতেন। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর উপদেশ। আকাশ প্রদীপের মতো জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শটিকে তুলে ধরে রেখেছিলেন।

গ্রামের বুড়িরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে মায়ের কাছে ছুটে এসেছে সালিসির জন্যে। সংসারে অন্যান্যদের ভীষণ রাগ। ভ্রাতুষ্পুত্রী চড়া গলায় মাকে তীব্র গালাগাল দিচ্ছে। তোমার প্রশ্রয়ে ক্ষণে ক্ষণে, যখন তখন এসে বাড়ির শান্তি নষ্ট করছে। মা কিন্তু শান্ত। ক্রোধের সামান্যতম প্রকাশ নেই। শুধু বলতে লাগলেন, মিষ্টি কথা বল, রাধু মিষ্টি কথা বল।

কাঠের পিঁড়িতে সামনের দিকে পা দুটি ছড়িয়ে বসে আছেন অবতারের শক্তি। পরিধানে নরুণপাড় কাপড়, হাতে বালা। কেউ তাঁকে চিনতে পারেননি তখনো। স্বামী প্রেমানন্দ লিখছেন, তাঁকে কে বুঝেছে, কে বুঝতে পারে? মায়ের স্থান অনেক উঁচুতে। স্বামীজীরও ওই এক কথা। জয়রামবাটীর মানুষ তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা করতে চেয়েছিলেন। জনৈক বৃদ্ধা একদিন বললেন, পাগলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সংসারসুখ হয়নি। এখন শিষ্যশিষ্যা নিয়ে কিছুটা সুখের মুখ দেখছে।

নারীজাগরণের ধুয়ো তুলে পুরুষরা নাচাচ্ছে! মহাভারতে এক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হয়েছিল, একালে শত শত দ্রৌপদীর লজ্জা হরণ করছেন ব্যবসায়ী দুঃশাসন। অবলাদের বোধ ছিল এই সবলারা নির্বোধ। নিবেদিতা কি বলছেন—

Shall we after centuries of Indian womanhood fashioned on the pattern of Sita and Savitri descend to the creation of coquesttes and Divorcess. নিবেদিতার শেষ কথা—ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী জননী সারদা। তিনি মা হলেন কবে! যেদিন দুর্মদ সভ্যতা মা হারা হল। যেদিন থেকে নারীকে বলা হতে লাগল সেক্স। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি—সিদ্ধিদাত্রী মা সারদা। অনেক নাচ নেচে অবশেষে, মা বাঁচাও। আমরা ভুলে বসে আছি, পৃথিবীর সব মানুষই কোনও না কোনও মায়ের সন্তান। সমস্ত মা যে শরীরে এক হয়েছেন, তিনিই মা সারদা। মাঝে মাঝে আপনমনে বলতেন, 'ঠাকুর, এত ভার আমি সইতে পারছি না'। আবার বলতেন, 'দুঃখী মানুষের ব্যথা কত বড় হলে বুঝবি। তুই তো মা নস্।' বলছেন কোনও বালকভক্তকে। তিনি স্নেহময়ী ছিলেন, স্নেহ-দুর্বলা ছিলেন না কিন্তু।

সারা জগৎ শিশুর মতো কাঁদছে, মা দুহাত বাড়িয়ে ডাকছেন, চলে আয় যন্ত্রণা মুছিয়ে দি। কি ভাবে? খানিকটা শক্তি ঢুকিয়ে দোবো। সেই শক্তিটা কি মা? আমার জীবনকথা। আমার চেয়ে দুঃখ কে পেয়েছে। আমার মতো যন্ত্রণা কে সহ্য করেছে!

বই নং 482
তারিখ
শিলিগুড়ি
09 FEB 2008